মিস্টার বাসুর ফরমুলা

অজেয় রায়

মিস্টার বাসুর ফরমুলা

মুখবন্ধ

অজেয় রায় হলেন প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক কিশোর উপন্যাসের জগতে একজন বিশিষ্ট লেখক। এঁর গল্পে সরস বাষায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য পিরবেশন করা হয়। এগুলি পাঠ্যপুস্তকের চাইতে বেশি মূল্যবান, কারণ ছেলেমানুষরা আনন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। এঁর প্রচ্ছন্ন রসিকতাগুলিও পরম উপভোগ্য। আজগুবি গল্প লেখা বরং সহজ, কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ আনন্দের উপাদানের অনেক বেশি দাম।

এই বইটিকে আমি স্বাগত জানাই এবং আশা করি তরুণ পাঠকরাও পড়ে এক অন্য জগতের আস্বাদ পাবে। ইতি—

আঃ লীলা মজুমদার

১৫ জুন ১৯৮৮

.

০১.

সুনন্দ ও অসিত মনমরা। কারণ তাদের মামাবাবু অর্থাৎ প্রাণিবিজ্ঞানী প্রফেসর নবগোপাল ঘোষকে পাখিতে পেয়েছে।

পাখি নিঃসন্দেহে জীবজগতের এক অভিনব সৃষ্টি। সুনন্দ বা অসিতের পাখি সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ নেই এমন নয়। বিচিত্র তাদের পালকের রঙ, আচার-আচরণ, আকৃতি। কোনো কোনো পাখির ডাক কী মধর! সৃষ্টির আদিমকালে কী আশ্চর্য কৌশলে সরীসৃপ থেকে বিবর্তনের ফলে এই খেচর গোষ্ঠীর উদ্ভব। শুধু ভারতবর্ষে আছে পঁচাত্তরটি পক্ষিপরিবার। তাদের প্রায় বারোশো গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। এবং তাদের মধ্যে তিনশো রকম পাখি যাযাবর–বিদেশ থেকে উড়ে আসে এখানে শীত কাটাতে। এসব তত্ত্ব বিলক্ষণ আকর্ষণীয়। সুনন্দর কাছে না হলেও অসিতের কাছে খবরগুলো নতুন বটে। তাই প্রথমটা সে আগ্রহ নিয়ে শুনত। তবে কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি কি ঠিক! কিন্তু মামাবাবুর ক্ষেত্রে। তাই যে ঘটছে!

মামাবাবুর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি অত্যন্ত বেঁকাল। যখন যা ধরেন, একেবারে চূড়ান্ত করে ছাড়েন।

পাখি সম্বন্ধে মামাবাবুর জ্ঞান যথেষ্টই ছিল। তবে এখন একেবারে কুঁদ হয়ে গেছেন। দিনরাত ওই নিয়ে পড়াশুনা করছেন, ভাবছেন ও আলোচনা করছেন। খাবার সময়ে পাখির কথা, বেড়াতে বেরোলে পাখির চিন্তা। চোখ দুটো তখন পায়ের কাছের জমি

ছেড়ে সদাই আকাশে বাতাসে টেলিগ্রাফের তারে, জানলার কার্নিশে বা গাছের ডালে পাখি খুঁজে বেড়ায়। অন্য কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলা তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন।

মামাবাবুর ইদানীং কিছু নতুন বন্ধু জুটেছিল। সব পক্ষিপ্রেমিক। এদের হাবভাবই আলাদা। যখন তখন এদের আগমন। সবচেয়ে বেশি আসতেন বঙ্কিম হাজরা। অবশ্য তারা সুনন্দ অসিতের ধাত বুঝে ফেলেছিল। বুঝতে পেরেছিল এই দুইজনের পক্ষিপ্রীতি মোটেই গভীর নয়। তাই সুনন্দদের সামনে পড়লে সামান্য ভদ্রতা করা ছাড়া আলাপের আগ্রহ দেখাত না। তাদের আলোচনার বৈঠক বসত। কখনো সবাই বেরোতেন ফিল্ড স্টাডি করতে। অর্থাৎ মাঠেঘাটে দূরবিন দিয়ে নানান পাখির স্বভাব চরিত্র লক্ষ করা। এদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য পক্ষিবিদ হিসেবে বেশ নামী। তবে বঙ্কিমবাবু এ লাইনে নেহাত আনকোরা। সুনন্দ তার নাম দিয়েছিল ভক্ত বঙ্কিম। ভদ্রলোককে নিয়ে তারা হাসাহাসি করত।

মামাবাবু মাইশোর গিয়েছিলেন পক্ষিবিদদের এক সম্মেলনে মাস তিনেক আগে। সেখান থেকে মাদ্রাজে বেদনথঙ্গল পক্ষিনিবাস দেখতে যান। পথে বঙ্কিমবাবর সঙ্গে আলাপ হয়। কৌতূহলী বঙ্কিমবাবু দুটো দিন মামাবাবুর সঙ্গে পাখি দেখে কাটান। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটায় ভদ্রলোকের এমন দারুণ আগ্রহ জন্মায় যে কলকাতায় ফেরার পরেও তিনি মাঝে মাঝে প্রফেসর ঘোষের কাছে এসে পাখি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে চলেছেন।

বঙ্কিমবাবুর সর্বক্ষণই একটু ব্যস্তসমস্ত ভাব। যদিও ব্যস্ত হবার কারণ তার নেই। সুনন্দরা শুনেছে ভদ্রলোকের পয়সা এবং অবসর দুই-ই অঢেল। চাকরি বা ব্যবসা করেন না। বাড়ির ভাড়া, শেয়ার ইত্যাদি প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তির আয়ে ভর করে দিব্যি কাটাচ্ছেন। স্ত্রী-পুত্রের ঝামেলাও নেই, কারণ তিনি অবিবাহিত। তবে ভারি অমায়িক লোক।

চেহারা সাধারণ। মুখ-চোখে খুত না থাকলেও বৈশিষ্ট্য নেই। অবশ্য রঙ ফর্সা। মাঝারি লম্বা। মাঝারি স্বাস্থ্য। মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল এলোমেলো হয়ে থাকে। কিন্তু ভদ্রলোক পোশাকের ব্যাপারে বেশ শৌখিন। চওড়া পাড়ের তঁতের ধুতি, পাঞ্জাবি, কাঁধে পাট করা চাদর, পায়ে পাম্প শু দিয়ে সর্বদা ফিটফাট থাকেন। ধূমপান করেন দামী ব্রান্ডের সিগারেট। দাড়ি-গোঁফ কামানো। পরিষ্কার মুখখানি হাসি-হাসি, তবে কিঞ্চিৎ বোকা-বোকা। লোকটির কথাবার্তাতেও মোটেই বুদ্ধির ছাপ নেই। যদিও মামাবাবুর কাছে হাজির হলেই তাঁর হাতে থাকে এক ভলম সেলিম আলির লেখা বার্ডস অফ ইন্ডিয়া এবং অত্যন্ত সিরিয়াস মুখে তিনি অন্যদের, বিশেষত মামাবাবুর কথা শোনেন ও বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়েন।

তবে ভদ্রলোকের এক মহৎ গুণ আছে অস্বীকার করা যায় না। মামাবাবুর কাছে এলে প্রায়ই এক বাক্স উত্তম কড়া পাকের সন্দেশ উপহার দিয়ে যান। এ নাকি গুরুদক্ষিণা। বলা বাহুল্য, সন্দেশের ভাগ সুনন্দ অসিতেরও জোটে।

যাহোক মামাবাবুর এই নতুন নেশায় সুনন্দ অসিতের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছে। আরও রাগের কারণ, মামাবাবু প্ল্যান করেছিলেন ভুটান বর্ডারে যাবেন অতি দুর্লভ গোল্ডেন লেসুর অর্থাৎ সোনালি হনুমান স্বচক্ষে দর্শনের চেষ্টায়। আপাতত সেকথা মনে করিয়ে দিলেও কানে তুলছেন না। বলছেন–হবে হবে। তাড়াহুড়োর কী?

ক্ষুব্ধ সুনন্দ রাগে ফুঁসছিল। শেষে একদিন অসিতের বাড়ি এসে বলল, চ আমরা দুজনে কোথাও ঘুরে আসি। পাখি-পাখি শুনে বাড়িতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আর তিষ্ঠনো যায় না।

হয়তো সত্যি তারা দুজনে কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত, যদি না সেদিন হঠাৎ কুণালের আবির্ভাব হত।

.

অসিতের বাড়ির বৈঠকখানায় একটি মুখ উঁকি মারল।

অসিত দেখল প্রথমে। ডাকল–আরে কুণাল যে! আয় আয় ভিতরে। অনেক দিন। পরে।

কুণাল মিত্র ছিল সুনন্দ ও অসিতের কলেজের সহপাঠী। চার বছর তারা একসঙ্গে পড়েছে। খুব ভাব ছিল তাদের। গ্র্যাজুয়েশনের পর তাদের ছাড়াছাড়ি হয়। কুণাল পড়তে

যায় রসায়ন বিদ্যা। পাস করে সে বছর চারেক এক কারখানায় কেমিস্ট হিসেবে চাকরি করে, তারপর কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করে। নানারকম জিনিস তৈরি করতে থাকে। প্রথম দিকে সাবান, কলমের কালি, মাজন ইত্যাদি তৈরির পর এখন গোটা দুই ওষুধও বানাচ্ছে। শুধু অন্যের আবিষ্কৃত ফরমুলায় তৈরি জিনিস নয়, নিজেও সে গোটা কয়েক ছোটখাটো ওষুধ উদ্ভাবন করেছে। কুণালের সঙ্গে সুনন্দদের আজকাল দেখা হয় কম। তবে পুরনো টানটা বজায় আছে।

কুণাল ঘরে ঢুকল। ওর চেহারায় বেশ চেকনাই এসেছে। পরনে দামী জামা-প্যান্ট। অর্থাৎ দু-পয়সা কামাচ্ছে আজকাল। সুনন্দরা খুশি হল। বেচারা অনেক কষ্ট করেছে গোড়ায়।

অসিত বলল, চা খাবি তো? আর সঙ্গে সেইরকম আলুর চপ চলবে নাকি? না, ওসব ছেড়ে দিয়েছিস?

খুব চলবে। চেয়ারে বসতে বসতে বলল কুণাল–তরে বুঝলি কিনা ওসব বস্তু একা খেয়ে সুখ নেই। সঙ্গে জুতসই আড্ডার পাট তো ভাই উঠে গেছে। কতবার ভাবি আসব তোদের কাছে, মোটে সময় পাই না।

ভালো ভালো, সুনন্দ হাসল, মানে তোর ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। তোর মিত্র কেমিক্যালস-এর উইপোকা তাড়াবার ওষুধটা তো খুব নাম করেছে। বিজ্ঞাপন দেখলাম কাগজে।

হ্যাঁ, ওটা বেশ চলছে।

চা এবং গরম আলুর চপ এল।

সুনন্দ লক্ষ করল, কুণাল মাঝে মাঝে কেমন আনমনা হয়ে পড়ছে। ও যেন কিছু বলতে চায় কিন্তু বলে উঠতে পারছে না। একসময় সুনন্দ বলে ফেলল, হারে কুণাল, স্রেফ আচ্ছা দিতে এসেছিস, না কোনো কাজ-টাজ আছে?

কুণাল একটু আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, মানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। ভাবছিলাম তোদের পরামর্শ নিই।

কথাটা বলে কুণাল একটুক্ষণ চুপ করে রইল। বোধহয় মনে মনে গুছিয়ে নিল ঘটনাগুলো। তারপর বলতে শুরু করল–

মাসখানেক আগে আমি একটা চিঠি পাই। ইংরেজিতে লেখা। জনৈক মিস্টার বাসু লিখেছেন। বক্তব্য–তিনি ধানের রাক্ষুসে পোকা মারার একটি রাসায়নিক ওষুধ আবিষ্কার। করেছেন। উপযুক্ত দাম পেলে ওষুধের ফরমুলাটি তিনি বিক্রি করতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে আমি আগ্রহী হলে যেন তাকে জানাই।

চিঠি পেয়ে ধাঁধায় পড়লাম। বাজে ফরমুলা বিক্রি করে ঠকানোর চেষ্টা এ লাইনে নতুন নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম দরকার নেই উৎসাহ দেখিয়ে। কিন্তু ধানের রাক্ষুসে পোকার উল্লেখে আমি মত বদলালাম। এগুলি একজাতীয় খুব ক্ষুদ্র কীট। চাষীরা নাম দিয়েছে রাক্ষুসে পোকা। ধানের শিষ একটু পুষ্ট হলেই এই পোকা তার শাঁস খেয়ে নেয়। ফলে শস্যদানা ছিবড়ে হয়ে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই পোকার উৎপাত ভারতে আগেও কয়েকবার দেখা গেছে, একরকম কীটনাশক ব্যবহার করে তাকে দমন করাও সম্ভব। হয়েছে–কিন্তু এবার পুরনো ওষুধে কোনো কাজ দিচ্ছে না। রাক্ষুসে পোকা ভীষণ তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে। ফলে হু-হুঁ করে ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিম বাংলায়–চব্বিশ পরগনা-হুঁগলিতে ছড়িয়েছে। আবার শুনছি দক্ষিণ অরতেও কয়েক জায়গায় উপদ্রব শুরু হয়েছে। কোনো রকমে তাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। উজাড় হয়ে যাচ্ছে ধান। এমন চললে নির্ঘাত দুর্ভিক্ষ লাগবে।

“এত খবর তুই পেলি কোথায়? কাগজে তো কিছু বেরোয়নি। জিজ্ঞেস করল সুনন্দ।

কাগজে কি আর সব খবর দেয়। এখন রোগটার সবে শুরু। আমি এসব খবর রাখি কারণ এখন আমি ফসলের ক্ষতিকারক রোগের ওষুধ তৈরির চেষ্টা করছি। এদেশে কোন ফসলের কী কী শত্রু, কী তাদের প্রতিকারের ওষুধ–এসব খবর রাখতে হচ্ছে তাই। মাস ছয় হল মিত্র কেমিক্যালস টমাটো গাছের শত্রু শুয়োলোকা মারার একটা নতুন কীটনাশক ছেড়েছে বাজারে। একজন কৃষি-বিজ্ঞানীর আবিষ্কার। আমার কারখানার ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ করেছেন। সুতরাং ভেবে দেখলাম মিস্টার বাসুর অফার একবার

যাচাই করে দেখি। যদি সত্যি ওষুধটা কাজের হয় এবং বাসুর চাহিদা আমার সাধ্যে কুলোয়, তাহলে আমার বরাত ফিরে যাবে। অতএব আমার আগ্রহ জানিয়ে উত্তর দিলাম।

চারদিন পরে রেজিস্ট্রি পার্শেলে এক প্যাকেট পাউডার এল। নমুনা পাউডার জলে গুলে কীভাবে ক্ষেতে ছিটোতে হবে তার নির্দেশও রয়েছে ইংরেজি টাইপে। মিঃ বাসু লিখেছেন–ওষুধের ফলাফল পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে যেন আমি চিঠিতে জানাই। তারপর সাক্ষাতে ব্যবসায়িক কথাবার্তা হবে।

এক্সপেরিমেন্ট করে আশ্চর্য ফল পেলাম। তক্ষুনি জানালাম বাসুকে, আমি ফরমুলা কিনতে চাই।

মিস্টার বাসুর নির্দেশমতো চৌরঙ্গির কুতুব হোটেলে সতেরো নম্বর ঘরে দুপুর দুটোর সময় তার সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথম দর্শনে বেশ হকচকিয়ে গেলাম। আশা করেছিলাম এক খোলামেলা বৈজ্ঞানিককে দেখব, কিন্তু তার বদলে দেখলাম রীতিমতো রাসরি সাহেবি কেতার এক মানুষ। গায়ের রং যদিও শ্যামবর্ণ কিন্তু পরনে নিখুঁত স্যুট টাই। কুচকুচে কার্লো চুল টেনে ব্যাকব্রাস করে আঁচড়ানো, মোটা গোঁফ, মুখে পাইপ, চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা। চশমার কাঁচের রং ঈষৎ নীল। উপরের পাটির সামনের দুটি দাঁত একটু বড় ও উঁচু। অল্প কুঁজো হয়ে সামনে ঝুঁকে হাঁটেন, কথা বললেন বেশির ভাগ ইংরেজিতে গম্ভীর গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে। হালকা গল্পের ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। সোজা কাজের কথায় এলেন। একগোছা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন–সলিউশন

বানানোর পদ্ধতি। ফরমুলার জন্য দর হাঁকলেন বিশ হাজার টাকা। টাকাটা একসঙ্গে দিতে হবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম ফরমুলার ওষুধের স্বত্ব বিক্রি করতে চাইছেন কেন? রয়ালটি রাখলে যারা এই ফরমুলায় ওষুধ বানাবে তাদের কাছ থেকে এই ওষুধ। বিক্রির আয়ের একটা ভাগ বরাবর পেয়ে যাবেন আপনি। মনে হয় তাতে মোট আরও বেশি অর্থ পেতে পারবেন ভবিষ্যতে।

উনি বললেন, আমার এখনই অনেক টাকার দরকার বছর বছর একটু একটু করে পেলে চলবে না। যদি এ ব্যবস্থায় আপনার আপত্তি থাকে তাহলে আর কথা বলে লাভ নেই।

আমি বললাম, আমার আর কী আপত্তি। এরপর আমি কাগজপত্রগুলো একটু দেখতে চাইলাম। ভদ্রলোক আমাকে ঘরে রেখে বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন ঘণ্টাখানেক বাদে। লেখার একটা অংশ ঠিক বুঝতে পারছিলাম না–তাই জিজ্ঞেস করলাম।

বাসু ভুরু কুঁচকে পড়লেন জায়গাটা। তারপর বললেন, জায়গাটা উনি আরও পরিষ্কার করে লিখে পাঠাবেন পরে।

এরপর আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তখন একটাও প্রশ্নের জবাব দিলেন না। প্রশ্নের জায়গাগুলো দাগ দিয়ে নিলেন। বললেন, কয়েকদিন পরেই আমি উত্তর পাব। তারপর কাগজ-পত্র গুটিয়ে সেদিন বিদায় নিলেন।

তিন দিন পরে আবার সেই কাগজ-পত্রগুলো এল আমার কাছে ডাক মারফত। প্রশ্নের জায়গাগুলো টুকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাউডারটা হাতে-কলমে বানাতে আমার কোনো অসুবিধাই হয়নি। এবার হবে ফাইনাল কথাবার্তা।

ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। তবু তেমন রহস্যের ইশারা পাচ্ছিল না সুনন্দ বা অসিত। সুনন্দ বলল, অর্থাৎ সলিউশনের ফরমুলাটা তুই কিনছিস?

পাগল। অত টাকা আমি পাব কোথায়?

তবে আর কথা বলার দরকার কী? চিঠিতে তোর মত জানিয়ে দিলেই তো চুকে যায়।

কুণাল বলল, "আসলে আমি বাসুর সঙ্গে যোগাযোগটা নষ্ট করতে চাইছি না। তাই ঝুলিয়ে রেখেছি।

কেন?

মানে আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কী?

কীটনাশক ওষুধটার প্রকৃত আবিষ্কারক হয়তো মিস্টার বাসু নন; অন্য কেউ।

"কী করে বুঝলি? প্রশ্ন করে অসিত।

পাউডারটা বানাবার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম দুটো প্রশ্ন আমি সত্যি ভালো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু উনি একটারও জবাব দিলেন না। মানে, মনে হল যেন উনি ধোঁকায় পড়েছেন। কেমন খটকা লাগল আমার। তখন পরের প্রশ্নগুলো করলাম নেহাত সোজা সোজা।

এক্সপেরিমেন্টের বিভিন্ন স্টেজে কেমন রেজাল্ট পাওয়া গেছে? গ্রীষ্মে এবং শীতের ধানে কি একই ডোজ ওষুধ ব্যবহার করতে হবে? ধানের ক্ষতিকারক আর কী কী পোকার উৎপাতে এই ওষুধ কাজে দেবে ইত্যাদি। সেগুলোরও জবাব পেলাম না। যে লোক ওষুধের আবিষ্কারক তার পক্ষে ওসব প্রশ্নের তক্ষুনি উত্তর না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া এত দামী ওষুধের সর্বস্বত্ব অবধি বিক্রি করে দিতে চায় এ খুব অস্বাভাবিক। আর বৈজ্ঞানিক হিসাবে মিস্টার বাসুর নামও কখনো শুনিনি আগে।

অর্থাৎ বলতে চাস, বাসু কারো ফরমুলা চুরি করেছে? বলল সুনন্দ।

হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে আসল আবিষ্কারকর্তাটি কোনো বিশেষ কারণে আড়ালে থাকতে চায়। বাসু তার হয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। মোট কথা আমি ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চাই। কিন্তু কীভাবে এগোব বুঝতে পারছি না।

সুনন্দ অসিত এতক্ষণে বুঝল কুণালের আগমনের উদ্দেশ্য। তারা পরস্পরে চোখাচোখি করল। মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল। অনেকদিন নিষ্কর্মা থেকে রোমাঞ্চকর কিছু একটা করার ইচ্ছেয় ছটফট করছিল দুজনে।

তোর সঙ্গে মিস্টার বাসুর আবার কবে দেখা হচ্ছে? জানতে চাইল অসিত।

আসছে কাল। বিকাল চারটে। স্থান হোটেল কুতুব। সতেরো নম্বর ঘর। মিস্টার বাসু চিঠিতে জানিয়েছেন।

ঘরের মধ্যে মিনিট তিনেক নিস্তব্ধতা। সবাই ভাবছে। অসিত একবার উঠে বাড়ির ভিতরে গিয়ে এক রাউন্ড চায়ের বন্দোবস্ত করে এল।

বাসু কি ওই হোটেলে থাকেন? সুনন্দ মুখ খুলল।

না। বলল কুণাল, আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। উনি হঠাৎ হঠাৎ এসে ওঠেন এবং একদিনের বেশি থাকেন না কখনো।

ওকে চিঠিপত্র লিখতিস কোন ঠিকানায়?

ওই হোটেল কুতুব। কেয়ার অফ ম্যানেজার। মাঝে মাঝে উনি নিজে বা ওঁর লোক এসে ডাক নিয়ে যায়।

হুম! সুনন্দ মাথার চুল টানছে। অর্থাৎ ভাবছে। তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, কাল আমরা ওকে ফলো করব। আমি আর অসিত। উনি হোটেল থেকে বেরোলেই। নিশ্চয় উনি বাড়ি ফিরবেন। একবার ওঁর আস্তানার খোঁজ পেলে তারপর ওর পরিচয় বা গতিবিধি জানা অসুবিধে হবে না। তখন জানা যাবে ওই ফরমুলার আসল আবিষ্কারকটি কে?

.

বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটা।

হোটেল কুতুবের গেট থেকে শ-খানেক হাত দূরে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা ছাইরঙা অ্যামবাসাডর, তার মধ্যে বসে আছে তিনজন–সুনন্দ, অসিত এবং তাদের বন্ধু মিন্টু।

গাড়িখানা মিন্টুর। মিস্টার বাসুকে ফলো করার জন্য গাড়িটা চাওয়া হয়েছিল মিন্টুর কাছে। বলা হয়েছিল কেবল গাহিটা পেলেই চলবে। সুনন্দ নিজেই ড্রাইভ করবে। বাসু যে ধরনের লোক, মনে হচ্ছে ট্রামে-বাসে ঘুরবেন না, ট্যাক্সি বা নিজের গাড়িতে যাওয়া-আসা করবেন। মিন্টু কিন্তু কেসটা শুনেই লাফিয়ে উঠল। সে বেজায় অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ডানপিটে। বলল সে স্বয়ং হবে গাড়ির চালক। তার খুব ইচ্ছে ছিল একজোড়া নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে আসে, কিন্তু সুনন্দ বারণ করল। হঠাৎ খুলে-টুলে গেলে বিশ্রী কাণ্ড হবে।

তিনজোড়া চোখ আটকে আছে হোটেল কুতুবের গেটে।

অধীর উত্তেজনায় ঘন ঘন সিগারেট টানছে মিন্টু। গেট দিয়ে কাউকে বেরোতে দেখলেই চট করে আঁকড়ে ধরছে স্টিয়ারিং হুইল। চারটে বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে হোটেলে ঢুকেছে কুণাল। বেরিয়েছে চারটে পঞ্চাশে। গেটের বাইরে এসে একবার আড়চোখে দেখে নিয়েছে সুনন্দদের। তারপর হনহন করে চলে গেছে উল্টো পথে।

ভাগ্য ভালো তাই বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছটা নাগাদ কুতুবের গেট দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল যে ব্যক্তি তাকে কুণালের বর্ণনা অনুযায়ী মিস্টার বাসু বলে চিনতে ভুল হল না। বাসুর হাতে একটা পেট-মোটা ফোলিও ব্যাগ। তিনি এদিক-ওদিক চেয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন এবং তাতে চড়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিন্টুর গাড়ি স্টার্ট দিল।

মিস্টার বাসুর ট্যাক্সি চলল চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ ধরে। প্রায় পঞ্চাশ হাত পিছনে থেকে মিন্টুর গাড়ি তাকে অনুসরণ করল।

সামনের ট্যাক্সি সোজা শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে পড়ল। তারপর টালা ব্রিজ পার। হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরল। অতএব বাসুর গন্তব্যস্থল কলকাতা শহরের বাইরে কোনো শহরতলি অঞ্চলে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। দিন ছোট তাই তখনই সন্ধ্যা নেমে গেছে। মিন্টুর সুবিধেই হল। অন্ধকারের জন্য সামনের আরোহী টের পাবে না যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। ট্যাক্সির পিছনের কাঁচের ভিতর দিয়ে মিস্টার বাসুর টুপি দেখা যাচ্ছে। নিশ্চল হয়ে বসে আছেন তিনি। আরও দু-খানা একই রকম ট্যাক্সি বালুর ট্যাক্সির আগু-পিছু যাচ্ছিল। ফলে বাসুর ট্যাক্সি কোনটা খেয়াল রাখা শক্ত হচ্ছিল। সিথির মোড়ে ট্র্যাফিক কনস্টেবল হাত দেখাল গাড়ি থামাতে, একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতে পারল। মিন্টু গাড়ি থামাতে থামাতে হঠাৎ আবার এক্সিলারেটার চেপে গতি বাড়িয়ে পেরিয়ে গেল মোড়। এবং তড়িৎবেগে যে ট্যাক্সিটা এগিয়ে গিয়েছিল তার পিছু ধরল। সামনের গাড়ির নম্বর দেখে সুনন্দ বুঝল ওটা। মিস্টার বাসুর ট্যাক্সি। অদ্ভুত নজর মিন্টুর, ঠিক লক্ষ করেছে।

অসিত বলল, ট্রাফিক পুলিশটা কিন্তু আমাদের গাড়ির নম্বর টুকে নিল। ফাইন করবে।

করুক গে। মিন্টু নির্বিকার।

আরও প্রায় পনেরো মিনিট হু-হুঁ করে ছুটল গাড়ি সিধে রাস্তা বেয়ে।

একটা বড় চৌমাথা। চারপাশে দোকান। অনেক লোকের ভিড়। রাস্তার পাশে একটা সিনেমা হল। জায়গাটা ছাড়িয়েই মিস্টার বাসুর ট্যাক্সি থেমে গেল।

মিন্টুর গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে খানিক এগিয়ে থামল পথের ধারে। গাড়িতে বসে তারা দেখল মিস্টার বাসু নামলেন–ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন–এবং বাঁ পাশে একটা সরু পথ ধরে হেঁটে অদৃশ্য হলেন।

মিন্টু তার গাড়ি ঘুরিয়ে সেই রাস্তার কাছে গেল।

পাকা রাস্তার খানিকটা অংশ খোঁড়া। মেরামতি হচ্ছে। এই কারণেই বাসুর ট্যাক্সি ঢোকেনি। তারাও নেমে পড়ল।

অসিত বলল, কোথায় এসেছে বুঝছিস? এটা পানিহাটি। এ রাস্তাটা সোজা গেছে গঙ্গার ধার অবধি।

কী করে জানলি? সুনন্দ জিজ্ঞেস করল।

এ জায়গা আমি চিনি। একটু দূরেই যে আমার সেজমাসির বাড়ি। এর পরের বাস। স্টপেজে নামতে হয়। কতবার এসেছি।

তিনজনে পথটা ধরে এগোল। গাড়ি রইল বড় রাস্তায়।

পথ প্রায় অন্ধকার। অনেক দূরে দূরে এক-একটা ল্যাম্পপোস্ট রয়েছে বটে, কিন্তু কুয়াশা ভেদ করে আলোর জ্যোতি খুব আবছা। শীতের রাতে দুধারের বাড়িতে জানলা-দরজা বন্ধ। নিস্তব্ধ লোকালয়। দু-একজন মাত্র পথিক আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে হনহন করে চলে গেল। তিনজনে দ্রুত পা চালাল–যতটা সম্ভব নিঃশব্দে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলল পথের ধারের বাড়িগুলো–সামনে কেউ যাচ্ছে কিনা।

অল্প এগিয়েই চোখে পড়ল মিস্টার বাসুর চলমান মূর্তি। তার জুতোর শব্দ উঠছে—খট্ খট্ খট্।

মিন্টু অসিত, সুনন্দ গা-ঢাকা দিয়ে এগোল।

রাস্তাটা অবশ্য সিধে নয়। অনেক এঁকেবেঁকে গেছে। হঠাৎ থামলেন বাসু। তরুনি সুনন্দরা গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। পুরনো লোহার গেট খোলার কর্কশ আওয়াজ। বাস ঢুকলেন একটা বাড়িতে।

তিনজনে গুটি গুটি এগোল।

যে বাড়িতে মিঃ বাসু ঢুকেছেন সেটা পাঁচিল ঘেরা একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে অনেকখানি বাগান। বাড়ির যতটুকু অংশ চোখে পড়ছে, কোনো আলোর চিহ্ন নেই। কোনো লোকজনেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তিনজনে গেটের সামনে থেকে সরে এল।

কী করা যায়?

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।

বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। কনকনে বাতাস বইছে। হাত-মুখ যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এভাবে কতক্ষণ থাকা যায়? তাছাড়া বে-পাড়া। দৃশ্যটা কেউ দেখে ফেললে ফল মোটেই ভালো হবে না। অসিত বলল, বাড়িটা তো চিনে গেলাম, এখন চল আমার মাসির বাড়িতে রাত কাটাই। সকালে এসে খোঁজ-খবর করা যাবে।

প্রস্তাবটা মনঃপূত হল সবার। কিন্তু মিন্টু থাকতে পারবে না। তার কাজ আছে খুব সকালে। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে সে বিদায় নিল। কারণ তার ধারণা কাল একটা জোর অ্যাডভেঞ্চার জুটে যাবে সুনন্দর বরাতে। সে প্রস্তাব দিয়েছিল–চল ঢুকি পাঁচিল টপকে। বাড়িটা সার্চ করি। হয়তো সেই বৈজ্ঞানিককে বন্দী করে রেখেছে।

কিন্তু তার বন্ধুরা এমন বেআইনি কারবারে রাজি হল না। সত্যি যে কাউকে এখানে আটক করে রাখা হয়েছে তার প্রমাণ কই? হয়তো বাসু স্বয়ং সেই বৈজ্ঞানিক। অথবা বৈজ্ঞানিকের বন্ধু। অতএব সেক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে পরের বাড়িতে প্রবেশের অপরাধে নির্ঘাত হাজতবাস ভোগ করতে হবে। আপাতত মিস্টার বাসুকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। কাল বরং এসে খোঁজ করা যাবে।

পরদিন বেশ সকাল-সকাল সুনন্দ অসিত এসে মিস্টার বাসুর বাড়ির সামনে হাজির হল। কীভাবে বাসুর সঙ্গে আলাপ জমানো যায়, কোন্ ছুতোয় বাড়ি ঢুকবে ইত্যাদি যুক্তি করছে তারা, এমন সময় একজনকে বাগানের রাস্তা ধরে গেটের দিকে আসতে দেখে তারা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। আগন্তুক–শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ওরফে ভক্ত বঙ্কিম।

বঙ্কিমবাবুও সুনন্দদের দেখতে পেয়েছিলেন। হাতজোড় করে বললেন–আরে কী ব্যাপার, আপনারা এখানে?

সুনন্দরা হকচকিয়ে গেল। কোনো রকমে সামলে নিয়ে অসিত বলল, "আমরা বেড়াতে এসেছি। এই কাছেই আমার মাসির বাড়ি। আপনি এখানে থাকেন নাকি?

পার্মানেন্টলি নয়। মাঝে মাঝে। বাড়িটা ভাড়া নিয়ে রেখেছি। গঙ্গার ধারে, দিব্যি খোলামেলা। কয়েকদিন কাটিয়ে যাই। আসুন ভিতরে।

অসিত একটু ইতস্তত করে বলল, আমরা ভেবেছিলাম বাড়িটা অন্য এক ভদ্রলোকের।

কেন? বঙ্কিমবাবু রীতিমতো অবাক।

মানে কাল সন্ধেবেলা ফিরছিলাম এই পথে। দূর থেকে দেখলাম কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক ঢুকলেন এই বাড়িতে, তাই।

ওঃ, বুঝেছি। মিস্টার বাসুকে দেখেছিলেন।বঙ্কিমবাবু হাসলেন। এ কিন্তু অন্যায়। যে কাউকে আমার এ বাড়িতে ঢুকতে দেখলে তাকে মালিক বলে ধরে নেবেন।

অসিত লজ্জিত হয়।–না মানে শীতের সন্ধে। এমন অসময়। বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে হয়নি। ভাবলাম আপিস ফেরতা কেউ। এদিককার লোকদের তো চিনি না ভালো।

বঙ্কিমবাবু বললেন, মিস্টার বাসু আমার ঠিক বন্ধু নন, সামান্য পরিচিত বলতে পারেন।

ও তাহলে নিশ্চয় জরুরি কাজ ছিল। তাই অমন সময়ে। খুব পাক্কা সাহেব।

হুঁ, তা বটে। ভদ্রলোক আমায় বড় জ্বালাচ্ছেন।

কেন?

আমাকে বিজনেস পার্টনার করতে চান। তাই নিয়ে ঝোলাঝুলি। যত বলছি ওসব হাঙ্গামা আমার পোষাবে না। কালকেও অনেকক্ষণ বকবক করে গেলেন।

ভদ্রলোক থাকেন কোথায়?

কলকাতায়।

কীসের ব্যবসা? সুনন্দ জানতে চায়।

দু-তিন রকম প্ল্যান আছে ভদ্রলোকের। আপাতত গেঞ্জির কল করতে চান। কিন্তু ধরনটা ঠিক বুঝছি না।

ওনার ঠিকানাটা দিতে পারেন? বলল সুনন্দ।

কেন? হাজরাবাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

মানে আমার এক বন্ধুর খুব ব্যবসার ঝোঁক। ছোটখাটো কিছু ফাঁদতে চায়। পার্টনার খুঁজছে। মিস্টার বাসুর খবরটা ওকে দেওয়া যেতে পারে, সুনন্দ উৎসাহিত হয়ে বলল।

বঙ্কিমবাবু মাথা নাড়লেন। সরি। ওঁর ঠিকানা তো জানি না। শ্যামবাজারে কোথাও। দিয়েছিলেন অ্যাড্রেস, হারিয়ে ফেলেছি।

আবার যদি আসেন অ্যাড্রেসটা নিয়ে রাখবেন দয়া করে।

বেশ নেব। তবে আর আসবে বলে মনে হয় না। সাফ না করে দিয়েছি এবার। আপনার বন্ধুর নাম-ঠিকানা?

সুনন্দ তৎক্ষণাৎ যে নাম-ঠিকানাটা জানাল তা কুণালের নয়–অশোক নামে তাদের এক বন্ধুর। অশোক ইঞ্জিনিয়ার। সম্প্রতি বাড়ি বানাবার কনট্রাকটারি করছে।

বঙ্কিমবাবু বললেন, চলুন একটু চা-টা খাবেন। আমার অবশ্য এখানে লোকজন নেই। একটি বুড়ো মালি ভরসা।

ভিতরে যেতে যেতে সুনন্দ লক্ষ করল বাগানে যত্নের বড় অভাব। ভালো ভালো ফল-ফুলের গাছের পাশে আগাছা জন্মেছে।

বাড়ির কোলেই গঙ্গা। চওড়া বাঁধানো ঘাট নেমেছে ধাপে ধাপে।

নিচের তলায় একটা মস্ত হলঘরে সুনন্দরা বসল। ঘরে পুরনো আমলের কিছু টেবিল চেয়ার।

চা আর অমলেট খাওয়ালেন বঙ্কিমবাবু।

সুনন্দ অসিত একটু লজ্জিত হল ভদ্রলোককে বিব্রত করার জন্য। উনি কিন্তু ভারি খুশি। প্রফেসর ঘোষের ভাগনে, অতএব তারা খাতিরের লোক। খানিক পরে শুরু করলেন পাখির কথা।-উঃ ব্যাপারটা কিন্তু সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং, মশাই। নতুন একখানা বই কিনেছি পাখি সম্বন্ধে–দাঁড়ান দেখাচ্ছি–

অমনি অসিত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। হেঁ হেঁ, আজ থাক। একটু কাজ আছে। আর একদিন আসব।

বঙ্কিমবাবু নিরাশভাবে বললেন, কিন্তু আমি যে আজই চলে যাচ্ছি দুপুরে।

কোথায়?

কলকাতা হয়ে রাজগীর, বুদ্ধগয়া, পাটনা, বেনারস লম্বা ট্যুর। বায়নাকুলার সঙ্গে নেব–বার্ড ওয়াচিং করা যাবে সুযোগমতো।

আপনি খুব বেড়ান?

হ্যাঁ, ওই আমার নেশা। বেশিদিন একজায়গায় টিকতে পারি না। দূরে যেতে না পারলে, অন্তত ধারেকাছেই ঘুরে আসি।

বিকেলে সুনন্দ অসিত ফিরল কলকাতায়।

বাসে যেতে যেতে অসিত বলল, "দেখ সুনন্দ, আমার মনে হচ্ছে বঙ্কিমবাবু মিস্টার বাসু সম্বন্ধে সত্যি কথা বলেননি।

কেন?

যথেষ্ট পরিচয় আছে অথচ তার ঠিকানাটা অবধি রাখেননি। এ ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

চেপে যাওয়ার কারণ?

তুই ফট্ করে বাসুর ঠিকানা চাইতে বোধহয় ঘাবড়ে গেলেন।

কেন?

বাইরে স্বীকার না করলেও হয়তো ওঁর মনে মনে বাসুর সঙ্গে ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে। শুনেছি উনি ব্যবসাদার বাড়ির ছেলে। বাবার লোহা-লক্কড়ের দোকান ছিল। আপাতত বাজিয়ে দেখছেন বাসুকে। চট করে কথা দিচ্ছেন না। এদিকে তুই বাসুর জন্যে নতুন পার্টনার জোগাড় করতে চাস শুনে ঠিকানাটা চেপে গেলেন।

তা হতে পারে–বলল সুনন্দ। আবার আর একটা কারণও থাকতে পারে। ওষুধের ফরমুলা চুরির ব্যাপারে ওনার সঙ্গে বাসুর যোগাযোগ আছে। তাই–

ধুৎ! বঙ্কিমবাবু সে-টাইপের নয়। কাছাখোলা লোক। তাছাড়া, তাহলে তো উনি নিজেই পেটেন্ট নিয়ে বিজনেস ফঁদতে পারতেন। অন্যকে ফরমুলা বিক্রি করতে যাবেন কোন দুঃখে। ওর কি টাকার অভাব?

তা বটে! সুনন্দ সায় দিল।

কুণাল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সুনন্দদের অভিযানের ফলাফল জানার আশায়। খবর শুনে সে মুষড়ে পড়ল। বলল, আমি মিস্টার বাসুর সঙ্গে ফরমুলার জন্য দরাদরি করেছিলাম। যদি তের-চোদ্দ হাজারে নামত, নিয়ে নিতাম। কে আসল বৈজ্ঞানিক তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতাম না। এক পয়সাও কমাতে রাজি হল না। যাকগে, তক্কে তক্কে থাকি যদি ফের খোঁজ পাই বাসুর। বলেছি ওনাকে ভবিষ্যতে আবার এমনি কোনো ফরমুলা বিক্রি করতে চাইলে দয়া করে আমায় একটা চান্স দেবেন। হ্যাঁ, একবার

কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার ল্যাবরেটরিটা কোথায়? অমনি বাসু কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন–তা জেনে আপনার দরকার নেই। আমি ঘাবড়ে গিয়ে আর ও-প্রসঙ্গ তুলিনি।

.

০২.

পুরো একটা বছর কেটে গেছে। মিস্টার বাসুর দেওয়া ফরমুলার প্রকৃত আবিষ্কারক কে এ-রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। কিন্তু ফরমুলাটির ভাগ্যে কী ঘটেছিল সে খবর জোগাড় করেছিল কুণাল।

মিস্টার বাসুর পেছনে ধাওয়া করে পানিহাটি যাওয়ার মাস দুই পরে একদিন সে অসিতকে ফোন করে প্রশ্ন করে–অসিত, মনে আছে মিস্টার বাসুর ফরমুলা?

হা হা, কী হল সেটার?।

সেটা কে কিনেছে জানিস? ভারত কেমিক্যালস লিমিটেড, পাক্কা কুড়ি হাজার টাকায়। বড় ফার্ম তো, তাই টাকার জোর বেশি। সেই ফরমুলায় তৈরি ওষুধই এখন এফ ফোরটিন

নামে বাজারে বেরিয়েছে। দারুণ কাটতি হয়েছে। আচ্ছা, হাজরাবাবুর কাছে কোনো খোঁজ পেলি মিস্টার বাসুর?

বঙ্কিম হাজরা মামাবাবুর কাছে আসেন বটে কিন্তু সুনন্দ বা অসিতকে একটু এড়িয়ে চলেন।

তবু একদিন তিনি এলে সুনন্দ তাকে ধরেছিল। এই যে বঙ্কিমবাবু, কেমন আছেন?

বঙ্কিমবাবু বিগলিত হেসে বললেন, এই কাটছে কোনো রকমে ঠাকুরের কৃপায়। প্রোফেসর ঘোষ বাড়ি আছেন?

হা আছেন। ওপরে যান। আচ্ছা, সেই মিস্টার বাসু আর এসেছিলেন আপনার কাছে?

না। আর আসেনি। কেন বলুন তো?

মানে ওনার ঠিকানাটা, আমার সেই বন্ধুর জন্যে...

ওহো, মনে পড়েছে। দেখা হলে নিশ্চয় চাইব।

বঙ্কিমবাবু এ বিষয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। হয়তো আর দেখা হয়নি মিস্টার বাসুর সঙ্গে।

জানুয়ারির শেষে মামাবাবু রাজস্থান গেলেন। ভরতপুরে কেওলাদেওখানা নামে এক পক্ষিনিবাস দেখতে। বঙ্কিমবাবুও মামাবাবুর সঙ্গ নিলেন। রাজস্থান থেকে পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি বেড়িয়ে কুড়ি-পঁচিশ দিন পরে ফিরলেন দুজনে। বঙ্কিমবাবুর উৎসাহেই এই বাড়তি বেড়ানোটুকু। মামাবাবু ফিরতেই আবার পক্ষিবিদদের আনাগোনা শুরু হল। মামাবাররা কী কী পাখি দেখেছেন তাই নিয়ে মহা উৎসাহে আলোচনা চলল।

মামাবাবু পক্ষিবিদদের আলোচনাসভায় সুনন্দ অসিতকে ডাকতেন না। মানে যোগ দেবার জন্যে জোর করতেন না। তবে একদিন সুনন্দকে ডেকে বললেন, কাল সন্ধেবেলা থেকো বাড়িতে। বিখ্যাত এক্সপ্লোরার স্যার ডেভিড ডানকান আসছেন। ওনার ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা শোনা যাবে। উনি ভোরে হংকং থেকে কলকাতা আসবেন আর পরদিনই চলে যাবেন আফ্রিকা। অসিতকেও আসতে বোলো।

স্যার ডেভিডের নামে সুনন্দ নেচে উঠল। এই দুর্ধর্ষ পর্যটক কত দেশ যে ঘুরেছেন তার ইয়ত্তা নেই। দুর্গম পাহাড়, বন, মরু, প্রান্তর চষে বেড়ানোই ওঁর নেশা। পক্ষিবিদ হিসেবে বেশি নামডাক থাকলেও নানান দেশের জীবজন্তু ফলমূল সম্বন্ধে ওঁর জ্ঞান অসাধারণ। স্যার ডেভিড নিউজিল্যান্ডার। নাইজার নদীর অববাহিকায় অনেক অজ্ঞাত অঞ্চল আবিষ্কারের সম্মানস্বরূপ তিনি স্যার উপাধি পেয়েছেন। স্যার ডেভিড নাকি অদ্ভুত ভালো

গল্প বলেন। তার গল্পের বর্ণনায় অজানা দেশের ছবি চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। পাঁচ বছর আগে সুইডেনের স্টকহোমে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে ডানকানের সঙ্গে মামাবারক বন্ধুত্ব হয়। সেদিনই দুপুরে কুণালের টেলিফোন এল।

আজ বিকেলে অসিতের বাড়ি চলে আয়, আমিও আসব। দরকারি কথা আছে।

কী ব্যাপার? সেই বাসু নাকি?

হ্যাঁ। আয় বিকেলে, বলব সব।

বিকেল নয়। সন্ধে ছটা নাগাদ কর।

কেন?

বিকেলে স্যার ডেভিডের লেকচার আছে আমাদের বাড়িতে। বিখ্যাত এক্সপ্লোরার। অসিতও আসবে শুনতে, তারপর যাব।

অল রাইট।

সুনন্দ উগ্রীব হয়ে উঠল। কী ব্যাপার? মিস্টার বাসুর কি খোঁজ পেয়েছে কুণাল? ফরমুলার প্রকৃত আবিষ্কারককে জানার সূত্র কি পেল কিছু? ডেভিডের লেকচার না থাকলে সে এখুনি ছুটে যেত কুণালের কাছে।

স্যার ডেভিড হাজির হলেন বিকেল চারটেয়। লম্বা পাতলা গড়নের মানুষটি। বয়স প্রায় ষাট ছুঁয়েছে, কিন্তু ইস্পাতের মতো দৃঢ়। যুবকের মতো চটপটে। হালকা লালচে দাড়ি, কপালে গালে অজস্র ভাঁজ-বহু কষ্টকর দিন যাপনের সাক্ষ্য। ভীষণ আমুদে। হেঁড়ে গলায় যখন তখন হো-হো হাসিতে ফেটে পড়েন। লোকটির একটি বদভ্যাস–উচ্ছ্বাসের মাত্রা প্রবল হলে ফুর্তির চোটে কাছের লোকের পিঠ চাপড়ে দেন সজোরে। একবার সেই কড়া পড়া কঠিন হাতের চাপড় খেয়ে সুনন্দর কঁধ ঝনঝন করে উঠল। সে সভয়ে সরে বসল।

স্যার ডেভিড কথা বলছিলেন ইংরেজিতে।

গত দু-বছর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে অরণ্যময় দ্বীপগুলিতে ঘুরেছেন। সেইসব অভিযানের গল্প শুরু করলেন–

ঘরে বঙ্কিমবাবুর মতো কয়েকজন পক্ষিবিদ উপস্থিত ছিলেন। তারা জানতে চাইলেন–ওইসব দেশে নতুন কোনো পাখি দেখেছেন কিনা স্যার ডেভিড।

হুঁ দেখেছি বৈকি। তাদের বর্ণনা নোট করা আছে। তারপর ডেভিড হাসতে হাসতে বললেন, গত বছর বোর্নিওর এক দুর্গম অঞ্চলে মাইগ্রেটারি বার্ড পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম!

কীরকম শুনি? সবাই উৎসুক আবেদন জানাল।

স্যার ডেভিড পাইপে লম্বা টান দিয়ে বলতে শুরু করলেন।

–খবরটা আমায় দেয় চিয়াং। সিঙ্গাপুরে চিয়াংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলাম একজন পক্ষিবিদ। বিশেষত যাযাবর পাখি নিয়েই তার স্টাডি। চিয়াং বলল, উত্তর বোর্নিওর সারওয়াক অঞ্চলে কাপুয়াস শৈলশ্রেণির কোলে বনের মধ্যে এক গ্রামে যাচ্ছে সে। ছোট্ট প্রসঙ্গ গ্রাম। কেলাবিট উপজাতির বাস। কাছাকাছি লোকালয় নেই। গ্রামে আধুনিক সভ্যতার কোনো স্পর্শই লাগেনি। আদিম প্রথায় চাষবাস আর শিকার করে জীবনধারণ করে। কেউ লেখাপড়া জানে না, গুনতে পারে না, মাস বা বছরের হিসেবও জানে না। আবার জায়গাটা বিষুবরেখার খুব কাছাকাছি বলে সারা বছর আবহাওয়া গরম থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়। ফলে বিভিন্ন ঋতুর পার্থক্য বোঝা যায় না।

কেলাবিটদের প্রধান খাদ্য চাল। বন কেটে, ঝোঁপ-ঝাড় আগুনে পুড়িয়ে তারা ধানচাষের জমি তৈরি করে। কিন্তু ধান যখন তখন পোঁতা চলবে না। বছরের শেষের দিকে, অন্তত

ডিসেম্বরের আগে পুঁততেই হবে। এই চাষের সময় ঠিক করতে তাদের প্রধান ভরসা কিছু যাযাবর পাখি। ওরাই তাদের ক্যালেন্ডার।

সেনসুলিট অর্থাৎ হলদে খঞ্জনের আবির্ভাব দিয়ে কেলাবিটদের বছর শুরু হয়। এই পাখিরা উত্তর চীন এবং সাইবেরিয়া থেকে বোর্নিও ইন্দোনেশিয়ায় শীত কাটাতে আসে। গ্রামে কেলাবিটরা তখন চাষের জন্য জোগাড় আরম্ভ করে।

এরপর আসে ব্রাউন ইক। মধ্য এশিয়া থেকে। গ্রামের লোক তখন ধান পোঁতা শুরু করে।

তারপর এক জাতের ছোট বাজপাখি জাপানি স্প্যারো হকদের পালা। এবং আরও কিছুদিন পরে ডিসেম্বর জানুয়ারি নাগাদ ছাইরঙা থ্রাশদের আগমন হয়। ব্যস, গ্রামের লোক ইতিমধ্যে ধান পোঁতা শেষ করে ফেলে।

ক্রমে ধানগাছ বড় হয়। ফসল কেটে নেওয়া হলে কেলাবিটরা ফের সেনসুলিটদের অপেক্ষায় থাকে।

আমি চিয়াংয়ের কাছে জানতে চাইলাম, ডিসেম্বরের মধ্যে ধান পুঁততে ওরা ব্যস্ত হয়। কেন? বৃষ্টিপাতের যখন তেমন হেরফের নেই। একটু দেরি হলেই বা ক্ষতি কী?

চিয়াং বলল, তারও কারণ এক জাতের যাযাবর পাখি–লম্বা লেজ মুনিয়া। ঠিক মার্চ মাসের গোড়ায় ঝুঁকে ঝাঁকে মুনিয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষেতে। তার আগে ধান ঘরে তুলতে না পারলে একটি দানাও আর রক্ষা পাবে না।

চিয়াং বলল, আমি গত বছর গিয়েছিলাম ওই গ্রামে। খঞ্জনাদের আবির্ভাব দেখার পর চলে আসি। এবার অন্য পাখিগুলো দেখতে যাচ্ছি।

আমি তক্ষুনি চিয়াংয়ের সঙ্গে জুটে গেলাম।

দক্ষিণ চীন সমুদ্রতীরে কুচিং শহর থেকে রওনা হয়ে কিছুটা মোটরে চড়ে তারপর বাজার নদী বেয়ে শ-খানেক মাইল গেলাম সাম্পানে। এরপর নৌকো ছেড়ে পায়ে হেঁটে। তিনদিন হাঁটলাম গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। ঠাসা ট্রপিকাল অরণ্য। বিরাট বিরাট আকাশ-ছোঁয়া গাছ আর বাঁশঝাড়। দিনের বেলাও মাথার ওপর ঘন পাতার আচ্ছাদন ভেদ করে সামান্য আলো তোকে। প্যাঁচপ্যাঁচে কাদা ও জলাভূমি। বিষাক্ত সরীসৃপ, পোকামাকড়, বনো শুয়োরের উৎপাত। আর এক ভয়, কখন হঠাৎ ওরাং ওটাংয়ের মুখোমুখি হব। উত্তর বোর্নিওর ঘন বনে এই বিশাল বানরদের বাস। এমনি লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু বিরক্ত হলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ক্রমে সেই গ্রামে পৌঁছলাম। বড় অধিত্যকায় মাত্র চল্লিশটি পরিবারের বাস। তিন-চারটে লম্বা লম্বা খড়ে ছাওয়া বাঁশের ঘরে তারা সবাই মিলে থাকে।

গ্রামের ধারে তাঁবু ফেললাম। চিয়াংয়ের সঙ্গে গ্রামের লোকের আগেই পরিচয় হয়েছিল। ফলে গ্রাম থেকে চাল, ডিম, তরকারি ইত্যাদি খাবার কিনতে অসুবিধা হল না। তবে একটা ভয় ছিল সাপ। সাংঘাতিক বিষাক্ত একজাতীয় ভাইপারের উপদ্রব। প্রতি বছর দু-একজন গ্রামের লোক মারা পড়ে সাপের কামড়ে।

দিন দশ দিব্যি কাটল।

ব্রাউন-শ্রাইকরা আসতে আরম্ভ করেছে। প্রথমে অল্প অল্প। তারপরে দলে দলে। চড়ুইয়ের চেয়ে সামান্য বড় পাখি। পেট সাদা, ডানার রং খয়েরি। ঝোপেঝাড়ে, জলের ধারে ধারে তারা পোকামাকড় খেয়ে বেড়াচ্ছে। গ্রামের লোকও ধান পুঁততে শুরু করেছে। হঠাৎ এক কাণ্ড!

ভোরে তাঁবুর বাইরে বসে কফি খাচ্ছি। চার-পাঁচজন কেলাবিট পুরুষ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। গ্রামের মোড়লও রয়েছে তাদের মধ্যে। লোকগুলোর হাব-ভাব মোটেই সুবিধের ঠেকল না। কয়েকজনের হাতে ছুরি ও বর্শা।

মোড়ল কড়া সুরে কী জানি বলল চিয়াংকে। চিয়াং কেলাবিট ভাষা জানত। দুজনে কথা শুরু হল। দুজনেই বেশ গরম হয়ে উঠল। অন্য লোকগুলোও কটমট করে চাইতে লাগল। আমি হতভম্ব। এ যাবত গ্রামবাসীদের তো বেশ ঠাণ্ডা বলে মনে হয়েছিল, কী আবার ঘটল?

চিয়াং একবার আমার দিকে ফিরে বলল,–এক ফ্যাসাদ বেধেছে। আমরা আসার পর গ্রামে এক রোগ দেখা দিয়েছে। দুজন লোক মরেছে। এরা আমাদের দায়ী করছে এই দুর্ঘটনার জন্য।

আমাদের কেন! আমি অবাক।

চিয়াং বলল, এদের দারুণ কুসংস্কার। ওদের ধারণা বিদেশিদের আগমনের ফলে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চটে গেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, বিশেষত লাল দাড়িওয়ালা বিদেশির আগমন দেবীর কোপের কারণ। অর্থাৎ তুমি। আমি এত বোঝাচ্ছি, কান দিচ্ছেই না। বলছে, এখুনি আমাদের চলে যেতে হবে গ্রাম ছেড়ে।

চিয়াং বেজায় গোঁয়ার। এত কষ্ট করে এসে তাড়াতাড়ি ফিরতে কিছুতেই রাজি নয়। মোড়লের সঙ্গে অনেক তর্ক করল। বলল, চলো দেখি কোথায় তোমাদের রুগী। আমি ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দেব।

গ্রামে গিয়ে একজন রুগী দেখলাম। লক্ষণ দেখে বিশেষ কিছু বুঝলাম না। মনে হল ঘোরালো ধরনের ফ্লু। এ-জ্বর নাকি এখানে কখনো হয়নি আগে। আমাদের সঙ্গে কিছু জ্বর-জ্বালার ওষুধ ছিল। তাই একটা ঠুকে দিলাম আন্দাজে, কিন্তু ফল হল মারাত্মক।

দু-দিন পরে দুপুরে ক্যাম্পে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। হঠাৎ কুড়ি-পঁচিশ জন কেলাবিট এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ঘাড়ে। এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের হাত-পা বেঁধে ফেলল।

শুনলাম আমাদের দাওয়াই খাটেনি। সেই রুগীটি পটল তুলেছে। সুতরাং গ্রামের লোক খাপ্পা। তারা আপাতত আমাদের বিচার করবে, ওই দেবীর সামনে শাস্তি দেবে। নইলে নাকি গোটা গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে দেবীর রোষে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল। কিন্তু সেগুলো নাগালের বাইরে। অসহায় অবস্থায় মরতে হবে নাকি?

সেই দূর অরণ্যভূমিতে সভ্য জগতের আইন-কানন খাটে না। বিচারের নামে এরা আমাদের ওপর যে কী অত্যাচার চালাবে কে জানে! হয়তো হত্যাই করবে।

চিয়াং মোডলকে বোকাল, আমরা এখনি চলে যাচ্ছি। মোড়ল একটু নরম হল।ও ছোকরাগুলো রাজি হয় না। চিয়াংকে রেহাই দিলেও আমাকে তারা ছাড়বে না। শেষে চিত্রা এক প্যাঁচে ফেলল। মোড়লকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে ঘষের লোভ দেখাল। আমের লোক আমাদের মালপত্র বাজেয়াপ্ত করলে মোড়লের বিশেষ লাভ নেই। কারণ তা ভাগাভাগি হয়ে যাবে। কিন্তু ঘুষ সবটাই পাবে স্রেফ মোড়ল একা। ওতেই কাজ হল।

মোড়ল অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্যদের রাজি করল আমাদের ছেড়ে দিতে। মোড়লের পায়ে সর্বস্ব সমর্পণ করে প্রায় এক বস্ত্রে গ্রাম ছেড়ে পালালাম।

তারপর তিন-চার দিন কাটল অসহ্য কষ্টে। খাদ্য বলতে জংলি কলা বা আরস। তার ঝলসানো মাছ। খোলা আকাশের নিচে শয়ন। কেবল বৃষ্টিতে ভিজেছি।

হতভাগারা রাইফেল কেড়ে নিয়েছিল। দুটো ছোট ছুরি ছাড়া আত্মরক্ষার আর অন্য ব্যবস্থা ছিল না। ভাগ্যিস নদীতে দেশি মাঝিরা কথামতো তামাদের অপেক্ষায় ছিল, তাই রক্ষে। উঃ, খুব শিক্ষা হয়েছে সেনার বার্ড-ওয়াচিং করতে গিয়ে!

স্যার ডেভিড এক চোট অট্টহাসির সঙ্গে গল্প শেষ করলেন। শ্রোতারাও চমৎকৃত।

স্যার ডেভিড বললেন, সেই গ্রামে রহস্যময় জ্বরের কারণ কিন্তু আবিষ্কার করেছিলাম পরে। ব্যাপারটা অদ্ভুত।

কী? কী? সবাই জানতে চাইল।

কুচিংয়ে চেনা এক ডাক্তারের কাছে দিলাম ওই জ্বরের বর্ণনা। ডাক্তার অনেক ভেবে, বই-টই উলটিয়ে জানালেন, আশ্চর্য! এই রোগ তো মধ্য এশিয়ায় হয়। এদেশে শোনা যায়নি। কী করে ছড়াল ওই গ্রামে?

ঝট করে মনে পড়ে গেল একটা কথা। চিয়াং ফিরে আসার সময় একজোড়া খয়েরি শ্রাইক এনেছিল। গ্রামের কাছে ফাঁদ পেতে ধরেছিল পাখি দুটো। ইচ্ছে ছিল চিহ্ন

দেওয়া। রিং পরিয়ে এই যাযাবর পাখিদের ছেড়ে দেবে। হঠাৎ পালাতে হল। তবু সে ছাড়েনি পাখি। বয়ে বয়ে এনেছিল পাখি দুটো।

ছুটে গেলাম চিয়াংয়ের হোটেলে। তার খুব জ্বর হয়েছে। তাই পাখিকে তখনও রিং পরানো হয়নি। খাঁচায় রয়েছে। পাখি দুটো নিয়ে গেলাম এক প্যাথলজিস্টের কাছে। লিটন পরীক্ষা করে বললেন, একটা পাখির ডানার পালকে ওই জ্বরের জীবাণু রয়েছে। অর্থাৎ মধ্য এশিয়া থেকে ওই পাখিগুলির কোনো কোনোটা বহন করে এনেছিল রোগের জীবাণ। চিয়াংয়ের জ্বরও সেই মধ্য-এশিয়ার মারাত্মক ব্যাধি। জ্বরের প্রকৃতি বুঝতে পেরে ঠিকমতো চিকিৎসা হতে সে সে-যাত্রা বেঁচে গেল।

গল্প শুনতে শুনতে হুঁশ ছিল না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তে সুনন্দ চমকে উঠল– সাড়ে ছটা। কুণাল এসে অপেক্ষা করবে অসিতের বাড়ি। অসিতেরও খেয়াল নেই, তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ে।

.

কুণাল অসিতের বাড়িতে অপেক্ষা করছিল।

কুণাল জানাল, শোন, মিস্টার বাসু টেলিফোন করেছিলেন আজ সকালে। তিনি নাকি গমের নেতানো রোগের একটা ওষুধ বের করেছেন। একটা সলিউশন। ফরমুলাটা বিক্রি

করতে চান। পেটেন্ট-রাইট শুদ্ধ। আগের বারেই মতোই। তোরা বোধহয় জানিস না, গম গাছে একটা অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছে আগের বছর থেকে। ব্যাকটিরিয়া অর্থাৎ জীবাণুঘটিত রোগ! এই রোগ পশ্চিম বাংলা এবং উত্তর ভারতের নানা জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে তাজা গম গাছ শিষ সমেত শুকিয়ে যায়। চাষীরা এর নাম দিয়েছে নেতানো রোগ। জানাশোনা কোনো জীবাণুনাশক ওষুধেও এ রোগ আটকানো যাচ্ছে না। আমি বলেছি ফরমুলা কিনতে চেষ্টা করব। কাল সকাল দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। হোটেল কুতুবে সতেরো নম্বর ঘর। এখন বল কী কর্তব্য?

সুনন্দ বলল, "কী আবার! বাসুকে ফের ফলো করতে হবে! ফরমুলা তুই কিনবি কিনা, সে তোের মাথাব্যথা। কিন্তু ওর আস্তানা জানতেই হবে। জানতে হবে ওর প্রকৃত পরিচয়। এমন সুযোগ ছাড়া যায় না।

কে ফলো করবে? আমরা? অসিত জিজ্ঞেস করল।

না। আগের ব্যাচের কেউ নয়। মিস্টার বাসু আগেরবার আমাদের খেয়াল করেছিলেন কিনা জানি না। তবু সাবধানের মার নেই। ফের সেই এক লোক পিছু ধরেছে দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে। তাই এবার ওকে অনুসরণ করবে নতুন লোক–বাচ্চু।

মানে তোদের পাড়ায় শেষ লাল বাড়িটায় থাকে? কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকান আছে?

হ্যাঁ। ও আগে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কাজ করত। এসব কাজে খুব পোক্ত। পেশা পালটেছে কিন্তু ডিটেকটিভগিরির শখটা যায়নি। এককথায় রাজি হয়ে যাবে। বাসু প্রথমে হোটেল থেকে গিয়ে কোথায় ওঠে সেটা বের করুক। তারপর আমরা আছি।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ বাচ্চু সুনন্দর কাছে হাজির হয়ে রিপোর্ট দিল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে মিস্টার বাসু ট্যাক্সি চেপে যান হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে লোকাল ট্রেন ধরে সপ্তগ্রাম। মেন লাইনে ব্যান্ডেলের পরেই ছোট এক স্টেশন। সপ্তগ্রামের কিছু দূর দিয়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড গেছে। স্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে বাস যান জি টি রোডের ধারে এক বাড়িতে। নিরালা জায়গায় মস্ত বাগানঘেরা ছোট দোতলা কোঠা বাড়ি। নাম–সুরভি নার্সারি। সারাদিন বাসুর আর দেখা পাওয়া যায়নি। বাড়িতে কে কে থাকে, স্থানীয় লোকজনের কাছে খোঁজ-খবর নিয়েছিল বাচ্চু। থাকেন তপন দত্ত বলে এক ভদ্রলোক। ইয়ংম্যান। তিন বছর হল বাড়িটায় নার্সারি করেছেন। নানারকম ফল, ফুল ও বীজ তৈরি করে কলকাতার বাজারে বিক্রি করেন। অতি অমিশুক। বাইরে বেরোন কদাচিৎ।

একাই থাকেন তপনবাবু। আর থাকে দুজন মালি এবং একটি বুড়ি-ঝি। সবাই বাইরের আমদানি। কেউ স্থানীয় লোক নয়। মিস্টার বার সঙ্গে ওখানকার কারো আলাপ হয়নি। তবে মুখ চেনে। আসা-যাওয়া করতে দেখেছে।

বাচ্চু বেশ রাত অবধি পাহারা দিয়েছিল বাড়িটা। অবশেষে শীতে কাবু হয়ে একটা জঘন্য নোংরা দোকানের বেঞ্চিতে শুয়ে কোনোরকমে রাত কাটায়। একজন ৬০কে লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় লোকদের একটু সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছিল বৈকি! তবে বাচ্চু বলেছে সে ইটের ব্যবসা করতে চায়, তাই জমি খুঁজছে। পরদিন সকালে সে খোঁজ করে শোনে যে বাসু খুব ভোরের ট্রেনে কলকাতার দিকে চলে গেছেন।

তপন দত্তকে দূর থেকে দেখছে বাচ্চু। ময়লা রং। খুব রোগা ছোটখাটো চেহারা। নার্সারির এক বুড়ো মালির সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল বাচ্চু। মালিটি জিনিস কিনতে এসেছিল। বাইরের দোকানে। মালি নিজের দেশ এবং স্ত্রী-পুত্রের সম্বন্ধে গাদাগুচ্ছের গল্প শোনালেও মিস্টার বাসু বা তপন দত্ত সম্পর্কে রহস্যজনকভাবে নীরব থেকেছে। ও-বিষয়ে কোনো আলোচনাই যেন করতে চায় না।

হ্যাঁ, একটা কথা মালি বেফাঁস বলে ফেলেছে, বাড়িতে ল্যাবরেটরি জাতীয় কিছু একটা আছে। ল্যাম্প জ্বেলে কীসব ওষুধ-টসুধ বানায় তপনবাবু।

কনগ্রাচুলেশনস, বাচ্চু! সুনন্দ অসিত চেঁচিয়ে উঠল। জব্বর খবর এনেছ ভাই। ওই তপন দত্তই নির্ঘাত আসল বৈজ্ঞানিক। পেট পুরে খাইয়ে দেওয়া হল বাচ্চুকে।

ঠিক হল আসছে কাল সুনন্দ ও অসিত সপ্তগ্রাম যাত্রা করবে তপন দত্তর উদ্দেশে। কুণালের ইচ্ছে ছিল সঙ্গে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে আটকে গেল ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে।

.

সুরভি নার্সারি।

সুনন্দ অসিত রিকশা থেকে নেমেই চট করে ঢুকল না ভিতরে। চারপাশে ঘুরে দেখতে লাগল। প্রধান দোতলা বাড়িটা ছাড়া বাগানের পিছনের অংশে আর একটা ইটের দেওয়াল ও টালির ছাদওলা বাড়ি নজরে পড়ল। এছাড়া রয়েছে আরো দুটো ছোট মাটির বাড়ি। একজন বুড়ো মতন লোক সামনে ফুলের বাগানে বসে কাজ করছে। দুজনে গেট খুলে গুটি গুটি ভেতরে ঢুকল।

তাদের দেখে মালিটি উঠে দাঁড়াল।

তপনবাবু আছেন? জিজ্ঞেস করল অসিত।

আপনারা কোথেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। দরকার আছে। ফুলের বীজ কিনতে চাই।

ও দাঁড়ান। দিচ্ছি ডেকে। লোকটি বাড়ির দিকে চলে গেল।

লোকটি তাদের না ডাকলেও সুনন্দরা পায়ে পায়ে এগিয়ে একেবারে বাড়ির সামনে হাজির হল। সদর দরজা বন্ধ। মালি ঘুরে খিড়কি দিয়ে ঢুকেছে।

দরজা খোলার আওয়াজ। এবং তারপর যে যুবকটি তাদের মুখোমুখি দাঁড়াল, তাকে দেখে দুজনে থ। আগন্তুকও অবাক।

প্রায় পনেরো-ষোলো বছর বাদে দেখা হলেও তপনকে চিনতে ভুল হল না তাদের। স্কুলে এই তপন দত্ত ছিল সুনন্দ-অসিতের সহপাঠী। যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল তাদের।

খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল তপন। ইংরেজি আর অঙ্কে খুব পাকা। কিন্তু বড় অভাবী। সব বই কিনে পড়তে পারত না। স্কুল থেকে বেরোবার পর ছাড়াছাড়ি হয় তাদের। আর দেখা হয়নি!

"আরে তপন তুই? সুনন্দই প্রথমে সামলে উঠল।

অ্যাঁ, তোরা? তপন থতমত খেয়ে গেল।

তুই এই নার্সারি করেছিস?

হ্যাঁ ভাই। চাকরির বাজার তো জানিস। কিছু জোটাতে পারলাম না সুবিধে মতো। তাই–

কদ্দুর পড়েছিলি? শুনেছিলাম তুই আশুতোষে ভর্তি হয়েছিলি, আই. এস-সি. নিয়ে।

হ্যাঁ। তবে পড়া এগোল না বেশি। এই বি. এস-সি, অবধি টেনেটুনে। তাও ফি জোগাড় করতে পারলাম না, তাই পরীক্ষা দেওয়া হল না। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। এটা সেটা কয়েকটা চাকরি করলাম, টিকল না কোনোটাও। তারপর নার্সারি করেছি। তা মন্দ নয়, চলে যাচ্ছে একরকম। তপন জ্ঞান হাসল।

তুই এ বিদ্যে শিখলি কোত্থেকে?

শিখেছি। বলতে পারিস নিজের চেষ্টায়। আয় ভেতরে।

নিচের ঘরে বসল সবাই।

ঘরে কয়েকটি সস্তা কাঠের চেয়ার টেবিল বেঞ্চি। একগাদা কাঠের প্যাকিং বাক্স এককোনায় গা করা। দেওয়াল-তাকে সুরভি নার্সারির লেবেল মারা কিছু প্যাকেট। টেবিলে কাগজপত্র ফাইল সাজানো। মনে হল এটা অফিসঘর।

তোরা আমার ঠিকানা পেলি কী করে? তপন জানতে চাইল।

পাইনি তো, আবিষ্কার করলাম এই মাত্র। বলল সুনন্দ– এসেছিলাম এইদিকে। নার্সারি দেখে ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হল। তাই বীজ কেনার নাম করে ঢুকলাম। তা আমরা কী জানি তোর নার্সারি! খাসা জায়গাটা কিন্তু।

চা-বিস্কুট খাওয়াল তপন।

সুনন্দরা লক্ষ করছিল, তপন কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। পুরনো বন্ধুদের দেখে খুশি হয়েছে বোঝা যায়, তবে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে তার যেন উৎসাহ নেই। হয়তো নিজের দারিদ্র্য ও ভাগ্যহীনতা প্রকাশ করতে লজ্জা পাচ্ছে।

একফাঁকে অসিত বলল, “তপন তুই নাকি একটা ল্যাবরেটরি করেছিস?

কে বলল? তপন ভুরু কোঁচকালো।

মালি। সাফ মিথ্যে চালিয়ে দিল অসিত।

একটু হেসে তপন বলল, "হ্যাঁ আছে। বীজগুলো শোধন করে নিই। সংক্রামক রোগের হাত থেকে বাঁচাতে। সে অতি সামান্য আয়োজন। পুরোদস্তুর ল্যাবরেটরির মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয়। আয় দেখবি।

অসিতদের পাশের ঘরে নিয়ে গেল তপন। দুটো টেবিলের ওপর একটা স্পিরিট ল্যাম্প ও একটা বার্নার। কিছু কাঁচের বাটি প্লেট টেস্ট টিউব। পাশে আলমারিতে কিছু শিশি–তাতে রাসায়নিক চূর্ণ ও তরল পদার্থ। দেখে বোঝা গেল তপনের কথা ঠিকই।

অনেকক্ষণ ধরে বলি-বলি করে যে প্রশ্নটা করতে চাইছিল দুজনে, সুনন্দ এবার সেই প্রসঙ্গ তুলল–

হ্যাঁরে, তোর কাছে মিস্টার বাসু নামে কেউ আসেন। গোঁফ আছে। সাহেবি পোশাক পরেন।

তপন কেমন চমকে উঠল।-কেন?

মানে একটু দরকার ছিল।

তপন জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল। উত্তর দিল না।

সুনন্দ বলল, আসল ব্যাপারটা খুলে বলি। ওই ভদ্রলোক এক মেডিক্যাল ফার্মকে একটা ওষুধের ফরমুলা বিক্রি করেছেন আগের বছর। ধানগাছের শত্রু রাক্ষুসে পোকা দমন করার কীটনাশক। আশ্চর্য ফল দিয়েছে ওষুধটায়। আমাদের এক পরিচিত লোকের কেমিক্যালস ফ্যাক্টরি আছে। তিনি মিস্টার বাসুর সঙ্গে দেখা করতে খুব আগ্রহী। কারণ নানা শস্য রোগের কিছু ভালো প্রতিরোধক যদি বাসু আবিষ্কার করে থাকেন, মিস্টার পাকরাশি তা কিনতে চান। আসলে সেবার মিস্টার বাসু পাকড়াশিকেই প্রথমে অফারটা দিয়েছিলেন। কিন্তু অচেনা লোককে বিশ্বাস না হওয়ায় পাকড়াশি পিছিয়ে যান। তখন বাসু অন্য কোম্পানিকে ফরমুলাটা বিক্রি করে দেন। এখনও পাকড়াশি সেকথা ভেবে হা-হুঁতাশ। করেন। ইদানীং গমে নাকি একরকম নতুন রোগ ধরেছে। নেতানো রোগ। মিস্টার বাসু যদি এই রোগের কোনো প্রতিরোধক বের করতে পারেন–তাই মিস্টার পাকড়াশি তার খোঁজ করছেন।

কিন্তু মুশকিল হল মিস্টার বাসুর ঠিকানা কেউ জানে না। কীভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়? পাকড়াশি আমাকেও বলেছিলেন মিস্টার বাসুর কথা–যদি তার ঠিকানা জোগাড় করে দিতে পারি। অ্যাক্সিডেন্টলি গত পরশু হঠাৎ মিস্টার বাসুর দেখা পেয়ে গেলাম। বাসুকে আমি দেখেছি হোটেল কুতুবে। সেবার পাকড়াশি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে বাসুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। অবশ্য তাদের কথাবার্তার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না।

যা হোক, গত পরশু এই পথ দিয়ে ব্যান্ডেলে যাচ্ছিলাম মোটরে। হঠাৎ দেখি মিস্টার বাসু সাইকেল রিকশা থেকে নেমে এই নার্সারিতে ঢুকলেন। তখন সময় ছিল না হাতে, অন্যের গাড়ি তাই। জায়গাটা চিনে রেখেছিলাম। তারপর আজ চলে এলাম।

তপন গম্ভীরভাবে শুনছিল। বাঁকা হেসে বলল-বুঝেছি, এই জন্যেই তোদের আগমন। কিন্তু ভাই আমিও মিস্টার বাসুর ঠিকানা জানি না।

বাসু এখানে আসেন?

আসেন মাঝে মাঝে। আসলে এই নার্সারির জমি আর বাড়ির মালিক হচ্ছেন মিস্টার বাসু। উনি কখনো কখনো এখানে আসেন। ভাড়া নিয়ে চলে যান। দু-একদিন বাসও করেন–ওই টালির ঘরটায়।

মনি অর্ডার বা চিঠি পাঠাসনি কখনো?

না, সে ব্যবস্থা নেই।

মিস্টার বাসু বোধহয় বায়োকেমিস্ট্রির লোক।

হুঁ, সায়েন্সের লোক।

আবিষ্কারটা ওর নিজের হলে বলতে হয়, আশ্চর্য প্রতিভা। অথচ অবাক ব্যাপার–সায়েন্টিস্ট মহলে কেউ ওঁর নাম জানে না। তোর সঙ্গে এ বিষয়ে আলো করেননি কখনো?

না।

তপনের মুখ ক্রমে থমথমে হয়ে উঠছিল। হয়তো বাসু প্রসঙ্গ তার মনঃপূত হচ্ছিল না। অসিত তাই কথা ঘোরাল–বাদ দে তোর মিস্টার বাসু। চল তোর বাগান দেখি।

বাগানে ঘুরল তিনজনে।

পরিচ্ছন্ন নার্সারি। গাছপালার মধ্য দিয়ে সরু সরু কাকর বিছানো পথ। তপন বন্ধদের চিনিয়ে দিল নানা ফুলফলের গাছ। তবু আড্ডার সুর যেন আর তেমন জমল না। কেমন ভাসা-ভাসা দায়সারা ভদ্রতা দেখাচ্ছিল তপন। বোধহয় মিস্টার বাসুর প্রসঙ্গই তার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল। সত্যি বলতে কি, এতদিন পরে তপনের খোঁজ পেয়ে সুনন্দ অসিত খুব। খুশি হলেও মিস্টার বাসুর হদিশ ফের হারিয়ে যেতে তারা বেশ দমে গিয়েছিল।

একবার তপন জিজ্ঞাসা করল–আচ্ছা ধানের রাক্ষুসে পোকা আর গমের নেতানো রোগ সম্বন্ধে কী বলছিলি যেন? আমার অবশ্য লাইন আলাদা–এ ব্যাপারে বিশেষ ধারণা নেই।

কুণালের মুখে এ বিষয়ে যা যা শুনেছিল তাই বলল অসিত। তপন দুপুরে খেয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু সুনন্দরা রাজি হল না। সেখানে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে ফিরল কলকাতা।

পথে অসিত বলল, "দেখ সুনন্দ, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তপন অনেক কথা চেপে গেল।

হুঁ, কিন্তু তাতে ওর স্বার্থ?

সেটাই তো ধরতে পারছি না। আচ্ছা তপন স্বয়ং সেই রহস্যময় বৈজ্ঞানিক নয়তো?

ধ্যেৎ! তপনের বিদ্যেতে এমন আবিষ্কার সম্ভব নয়।

কুণাল শুনে রেগে বলল–অদ্ভুত ব্যাপার! লোকটা বারবার যেন পিছলে যাচ্ছে। কেন বাস কাউকে তার ঠিকানা জানান না! এত লুকোচুরি কীসের?

সুনন্দ হেসে বলল, হয়তো তোদের মতো ফরমুলা-চোরদের হাত এড়াতে। বৈজ্ঞানিকের সাধনা গাপ মেরে দেবার মতো সৎ লোকের তো অভাব নেই দেশে। তাই তো এত সাবধানতা।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকটি যে বাসু, এইখানেই আমার ঘোর সন্দেহ। কারণ ফরমুলা সংক্রান্ত কাগজ পরীক্ষা করে এবারও আমি একটা ফ্যাকড়া তুলেছিলাম। ওষুধটা সিসটেমিক অর্থাৎ প্রয়োগ করলে সলিউশনের রাসায়নিক বস্তু উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে। এবং তাকে আক্রমণকারী জীবাণুর পক্ষে বিষাক্ত করে তোলে। বললাম–সলিউশন ক্ষেতে স্প্রে করার পর তার প্রভাব দূর হতে কতদিন লাগবে সেটা তো লেখা নেই পরিষ্কারভাবে। পাকা গম কাটার অন্তত কতদিন আগে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত? নইলে যে ফসল বিষাক্ত হয়ে থাকলে মানুষের ক্ষতি করবে।

বাস বললেন–সেসব ডিটেলস পরে দেব। সমস্ত নোট করা আছে। এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

যে তোক হাতে-কলমে এই ওষুধ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছে তার পক্ষে এই তুচ্ছ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য নোট কনসাল্ট করতে চাওয়া হাস্যকর। পরিষ্কার মনে থাকার কথা। তাই বাসু সম্বন্ধে আমার সন্দেহটা আরও বেড়েছে।

দিন চারেক পরে এক দুপুরে উদভ্রান্ত কুণাল অসিতের বাসায় এসে হাজির হল।

কী ব্যাপার?

কুণাল বলল, হরিধনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কে হরিধন?

মিত্র কেমিক্যালস-এর একজন সেলসম্যান। ঘুরে ঘুরে ওষুধ বিক্রি করে। খুব চালাক-চতুর ছেলে। ওকে গতকাল হোটেল কুতুবের সামনে পাহারায় বসিয়েছিলাম।

কেন?

দুদিন আগে কুতুবের ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলাম মিস্টার বাসুর খোঁজে। বললাম–ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার। প্রথমে স্রেফ এড়িয়ে গেল ম্যানেজার। শেষে অনেক পেড়াপীড়িতে মুখ খুলল। বাসুর সঙ্গে আমার দুবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে, তা তো সে দেখেছে। বলল, মিস্টার বাসু নাকি শিগগিরি আসতে পারেন হোটেলে। কয়েকখানা চিঠি এসেছে ওঁর নামে, সেগুলো নিয়ে যাবেন। বাসু ফোনে তাই জানিয়েছেন। ম্যানেজারকে অনুরোধ জানালাম–মিস্টার বাসুকে বলবেন, আমি ওঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই। কোথায় কখন দেখা হবে যেন চিঠিতে জানান।

ফিরে গিয়ে হরিধনকে বললাম যদি বাসুর ঠিকানা বের করে দিতে পারো তোমার প্রোমোশন হবে। হরিধন তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। গত রাতে হরিধন বাসায় ফেরেনি।

আজ সারা সকাল থানা-হাসপাতাল চষে বেড়িয়েছি। হরিধনের পাত্তা নেই। ওর বাড়ির লোক কান্নাকাটি করছে। হয়তো আমার জন্যেই বিপদে পড়ল ছেলেটা?

কাল বাসু এসেছিলেন কুতুবে?

হ্যাঁ, বিকেল পাঁচটায় আসেন, খানিক পরে চলে যান।

কুণালের সঙ্গে বেরলো দুজন। অনেক খোঁজাখুঁজি করল বিকেল অবধি। হরিধনের খোঁজ পাওয়া গেল না। সন্ধেবেলা মামাবাবুর বাসায় ফিরতে বাধ্য হল সুনন্দ অসিত। কারণ স্যার ডেভিড ডানকান আসবেন আজ। সেই উপলক্ষে আরও কয়েকজন অতিথি আসবেন বাড়িতে। তাদের যত্নের ভার সুনন্দদের ওপর।

আবার আগামীকাল এক প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে আছে। মামাবাবু ডানকানকে নিয়ে কলকাতার বাইরে যাবেন বেড়াতে। সুনন্দ অসিত যাবে সঙ্গে।

সুনন্দদের ইচ্ছে ছিল না কুণালকে ফেলে রেখে যায়। কুণালই জোর করল–তোরা আর থেকে কী করবি। মাঝ থেকে প্রোফেসর ঘোষের অসুবিধে হবে। তোরা যা–

ভাগ্যিস গিয়েছিল তারা। নইলে এক অতি জটিল রহস্যের জাল হয়তো কোনোদিনই ভেদ করা সম্ভব হত না।

রাতে সুনন্দ একবার ফোন করল কুণালকে–হরিধনের খোঁজ পেলি?

উত্তর এল–না।

.

০৩.

আফ্রিকা সফর সেরে হইহই করে উপস্থিত হলেন স্যার ডেভিড ডানকান। ডানকান গিয়েছিলেন মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকায় অতি দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে—ওকাপি নামে এক দুর্লভ প্রাণী দর্শনের আশায়। ওকাপি জিরাফের জ্ঞাতি। ১৯০০ সালে এই জন্তুটি প্রথম আবিষ্কার হয়। বন্য ওকাপির স্বভাবের বৈচিত্র্য আজও জানা যায়নি। তার কারণ শুদ্ধ গভীর জঙ্গল, অল্প সংখ্যা বা তাদের লাজুক স্বভাব নয়–ওই একই জঙ্গলে বাস করে বর্বর পিগমি বা বামন জাতি। তাদের বিষাক্ত তিরকে সবাই ডরায়।

স্যার ডেভিড লুকিয়ে ওকাপির ছবি তুলেছেন, পিগমিদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের সাথে নাচ-গান করেছেন এবং নিতান্ত উপস্থিতবুদ্ধির জোরে চিতাবাঘের কবল থেকে প্রাণে বেঁচে গেছেন। গোটা সন্ধে সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনল তাঁর গল্প।

পরদিন খুব ভোরে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে রওনা হল পাঁচজন—মামাবাবু, ডানকান, সুনন্দ, অসিত এবং বঙ্কিম হাজরা। তিনি ঠিক ম্যানেজ করে ঢুকে পড়েছেন দলে। বীরভূমে যে ঝিল দেখতে যাওয়া হচ্ছে, শীতকালে সেখানে প্রচুর যাযাবর হাঁস নামে। ডানকানের ইচ্ছে পশ্চিমবাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবেন, সঙ্গে খানিক বার্ডওয়াচিং হলে তো সোনায় সোহাগা।

এই ঝিলে আগে কয়েকবার গেছেন মামাবাবু। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে জলাভূমি। কিছুদুর দিয়ে বইছে সরু পাহাড়ি নদী কোপাই। ঝিলের কাছে একটি মাত্র গ্রাম বৈকুণ্ঠপুর। গ্রামের লোকরা বৈষ্ণব, তারা ঝিলের পাখি মারে না, বাইরের কাউকেও মারতে দেয় না। অতএব ঝিলের জলে এবং আশেপাশে পাখিরা নির্ভয়ে চরে।

বোলপুর স্টেশনে সকাল এগারোটা নাগাদ ট্রেন থেকে নামল পাঁচজনে।

বৈকুণ্ঠপুরের শ্রীমন্ত বৈরাগী মামাবাবুদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল স্টেশনে। শ্রীমন্ত মামাবাবুর পুরনো পরিচিত। বছর চল্লিশ বয়স। ভারি বিনয়ী। সর্বদা মুখে মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে। মামাবাবুর সঙ্গে ঘুরে বার্ডওয়াচিং সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে শ্রীমন্তর।

তিনটে সাইকেল রিকশা ভাড়া করা হল। শ্রীমন্ত চলল বাইসাইকেলে। মাইল দুই যাবার পর রাস্তা খারাপ হয়ে উঠল। এই মেঠো রাস্তায় রিকশা চলে না–গরুর গাড়ি চলে। শুধু মালপত্র নিয়ে রিকশা চালকরা চলল গাড়ি ঠেলে ঠেলে।

শীতের রোদ্দুরে হাঁটতে কষ্ট নেই। গল্প করতে করতে এগোল সবাই। দুপাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেতি জমি। বর্ষাকালে সারা মাঠে ধান চাষ হয়। শীতে অবশ্য অনেক জমি খালি পড়ে আছে। তবে যে জায়গায় জলসেচের সুবিধে আছে সেখানে টুকরো টুকরো জমিতে চাষ হয়েছে। কোথাও ধান কোথাও বা গম।

পথের ধারে এক ছোট্ট গ্রাম পড়ল। বট অশ্বত্থ আম জাম তেঁতুল গাছে ছায়াচ্ছন্ন। ঝুপড়ি চায়ের দোকানও রয়েছে একটা। একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। চায়ের অর্ডার দিয়ে দোকানের বাইরে বেঞ্চে বসল সবাই। রিকশাওলারাও রিকশা রেখে এসে দোকানের পাশে ঘাসে বলে পড়ল।

দেখতে দেখতে ছোটখাটো এক ভিড় জমে গেল মামাবাবর পার্টিকে ঘিরে। ছোট ছেলেমেয়ে, অকর্মা লোক তো আছেই–যারা কাজে যাচ্ছিল তারাও হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেল। রিকশাওলা ও শ্রীমন্তকে হাজারো প্রশ্ন করতে লাগল আগন্তুকদের সম্বন্ধে। ডানকান সাহেবই তাদের প্রধান আকর্ষণ। সাহেব নিজে কিন্তু বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করলেন না। বললেন–এ আমার অভ্যেস আছে। অচেনা জায়গায় এমনও হয়েছে যে কয়েকশো লোক গা ঘেঁষে বসে আমায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লক্ষ্য করেছে। শোওয়ার সময় অবধি রেহাই

দেয়নি। আবার গায়ে আঙুল ঘষে যাচাই করে দেখছে রংটা আসল না নকল। একবার হয়েছিল কী জানো? ইস্টার্ন তুর্কিস্থানে গোবি মরুভূমির প্রান্তে মঙ্গোলিয়ানদের এক গ্রামে সন্ধের ঠিক আগে পৌঁছলাম আমি আর তেহেরান ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজির প্রোফেসর ডক্টর বেন গাজি–

গেল গেল, নিয়ে গেল। ধর ধর! হেট হেট–ইত্যাদি বহু কণ্ঠের উত্তেজনাময় বাক্যস্রোতে ডানকানের গল্পে অকালে ছেদ পড়ল।

সচকিত হয়ে দেখল সবাই একপাল ছোট ছেলে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে একদিকে ছুটে গেল। তারা ঘাড় তুলে কাছে এক বিরাট তেঁতুল গাছের ডালে তাকিয়ে দেখছে, উত্তেজিতভাবে অঙ্গভঙ্গি করছে এবং ঢিল ছুঁড়ছে ওপরে।

তাদের উত্তেজনার কারণ প্রথমে ধরা গেল না।

তারপরই শ্রীমন্ত লাফ দিয়ে উঠে ছুটল গাছের দিকে–হেই বাবা, সব্বনাশ হয়ে গেল।

মামাবাবুরাও হাজির হলেন গাছের নিচে। ব্যাপার বুঝে সবার চক্ষুস্থির।

এক মস্ত লালমুখো বাঁদর গাছের উঁচু ডালে গ্যাট হয়ে বসে আছে। তার হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ব্যাগের মালিক-বঙ্কিমবাবু।

বাঁদরটা ব্যাগের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ফেলেছে। এবং হাটকে হাটকে ব্যাগের ভিতরকার জিনিস বের করে প্রত্যেকটি চোখের সামনে একবার ঘুরিয়ে দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। বোঝা গেল খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুতে তার রুচি নেই।

বঙ্কিমবাবু তো এই দৃশ্য দেখে বিকট আর্তনাদ করে নৃত্য জুড়ে দিলেন।

গ্রামের একজন বলল, ভারি শয়তান বাঁদর, বাবু। কী উৎপাত যে করছে! একজন এনেছিল পুষবে বলে। বাগ মানেনি। বুনো হয়ে গেছে।

ধপ! এবার ব্যাগটা পড়ল মাটিতে। বাঁদরটা কী জানি চিবুচ্ছে। বঙ্কিমবাবু জানালেন– নিশ্চয় পিপারমেন্ট। ছিল এক বাক্স।

বঙ্কিমবাবু পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে তাঁর ফেলে দেওয়া জিনিস উদ্ধার করতে লাগলেন। সুনন্দ, অসিত, মামাবাবু, ডানকান সাহেব–আর গ্রামসুদ্ধ লোক তাকে সাহায্য করতে লেগে গেল। যাহোক আধঘণ্টার মধ্যে হারানো জিনিস প্রায় সবই উদ্ধার হল। অবশেষে ফের রওনা দিল তারা।

বৈকুণ্ঠপুরের ঝিল সত্যি অপূর্ব।

অন্তত আধ মাইল লম্বা, হাত পঞ্চাশ চওড়া জলাশয়। চারিধারে উঁচু পারে তালগাছের সারি এবং শর ঝোঁপ। তীরের কাছে অগভীর জলে কিছু নলখাগড়া ও আগাছা জন্মেছে। ঝিলের তিন পাশে চাষের ক্ষেত। একপাশে উঁচু-নিচু লালচে রুক্ষ খোয়াই। খোয়াইয়ের পথে মাইল দেড় গেলে কোপাই নদী। ঝিলের পশ্চিম দিকে প্রায় দুশো গজ দূরে বৈকুণ্ঠপুর।

শীতের দুপুরে গাঢ় নীল জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। আর জলের বুকে মনের আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে অসংখ্য হাঁস। শুধু হাঁস নয়, আরও অনেক রকম পাখি–কেউ ভাসছে জলে, কেউ চরছে পারের কাছে ডাঙায়। কেউ ডানা মেলে উড়ছে আকাশে। এতগুলো মানুষের আগমনে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বোঝা গেল এরা মানুষকে ভয় করে না।

ডানকান তো দৃশ্য দেখে মুগ্ধ।

মামাবাবু, ডানকান এবং বঙ্কিম হাজরা চোখে দূরবিন লাগালেন পাখি দেখতে।

সুনন্দ অসিত, শ্রীমন্ত ও আরও কয়েকজন বৈকুণ্ঠপুরবাসীর সহায়তায় তিনটে তাঁবু খাঁটিয়ে ফেলল ঝিলের কাছে। গ্রামের লোক তাদের রাতে থাকার জায়গা দিতে চেয়েছিল কিন্তু মামাবাবু ও ডানকান এমন খাসা জায়গাটি ছেড়ে বদ্ধ ঘরে ঘুমোতে রাজি হলেন

না। ডানকান হেসে বললেন, বুঝলে ব্রাদার, সত্যি বলতে কি ক্যাম্পে শুতে আমি নিজের বেডরুমের চেয়েও আরাম পাই। অভ্যেস!

বৈকুণ্ঠপুরের ঝিলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রয়েছে পিনটেল বা সূচ্যগ্রপুচ্ছ হাঁস। জলের মধ্যিখানটা তাদের দখলে। এরা যাযাবর। উত্তর এশিয়া ও ইউরোপ থেকে শীতকালে এদেশে আসে। বেশ বড় হাঁস।

ঝিলে আর এক জাতের হাঁস ছিল—নাক্‌টা। আকারে পিনটেলের চেয়েও বড়। নাকটা যাযাবর নয়। এখানে স্থায়ীভাবে বাস করে।

হাঁস ছাড়াও জলে সাঁতার কাটছিল কিছু পানকৌড়ি। তীরে গাছের ডালে বা মাটিতে বসেছিল কয়েকটি ধ্যানমগ্ন বক। থেকে থেকে জলে ছোঁ মারছিল মাছরাঙা। দূরে খোলা মাঠের আকাশে প্রকাণ্ড ডানা মেলে উড়ছিল শামুকখোল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে আসা হয়েছিল স্টেশনে। এক রাউন্ড কফি খেয়ে সবাই চলল নদী দেখতে।

অগভীর ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী। টলমলে জলে হাঁটু অবধি ডোবে না। তবে বর্ষায় নাকি এই নদীতেই বান ডাকেকূল ছাপিয়ে যায় জল। নদীতটে ঝোঁপ-ঝাড়, হালকা জঙ্গল। ভারি নির্জন। এই জায়গা নানা জাতের পাখির আদর্শ বিহারভূমি।

মামাবাবু উত্তেজিতভাবে ডানকানকে খোঁচা মারলেন ওই দেখুন একজোড়া ব্রাহ্মণী হাঁস।

অ্যাঁ, হাঁসেরও বামুন কায়েত আছে? আশ্চর্য হয়ে বললেন বঙ্কিমবাবু।

“না না, সে ব্রাহ্মণী নয়, হাঁসের নাম। চলতি বাংলায় যাদের বলি চকাচকী। বললেন মামাবাব। এরাও যাযাবর হাঁস। তুর্কিস্থান সিকিম তিব্বত ইত্যাদি দেশ থেকে আসে। সর্বদা জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে।

মামাবাবু গ্রামের লোকের সাহায্যে ঝিল ও নদীর তীরে কয়েকটা পাখি ধরার ফাঁদ পাতলেন। পাখি ধরে তাদের পায়ে রিং পরানো হবে। রিং বের করে দেখালেন তিনি। ছোট ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বলয়। তাতে পাঞ্চ করে খুদে খুদে অক্ষরে ছেপে দেওয়া হয়–রিং পরানোর তারিখ, কে পরাচ্ছে, কোথায়, পাখির ওজন কত ইত্যাদি তথ্য। বিশেষ করে যাযাবর পাখিদের জানতে এই রিং পরানোর প্রয়োজন খুব বেশি।

শীতের শেষে যাযাবর পাখির দল আবার নিজের দেশে ফিরে যাবে। হয়তো দূর দেশে এখানের রিং পরানো কোনো পাখিকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে। পক্ষিবিশারদরা তখন ওর পায়ের রিং দেখে জানতে পারবেন পাখিটা কত দূরে গিয়েছিল, কবে, ইত্যাদি খবর।

দিনান্তের অস্পষ্ট আলো যখন যাই-যাই করছে, আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত অস্তগামী সর্যকিরণের আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে, তখন দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য। পিনটেলরা ঝাঁকে ঝাকে উড়তে আরম্ভ করল জল ছেড়ে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রথমে ঝিলের ওপরে কয়েক পাক ঘুরে তারা উঠে গেল বহু উঁচুতে। তারপর তীরবেগে অদৃশ্য হল দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে। তাদের ডানায় শনশন আওয়াজ হচ্ছিল যেন ঝড়ের বাতাস। নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তারা এখন চরতে চলল–দূরে খাল-বিল-শস্যক্ষেতে। কারণ রাতের আঁধারে শিকারীর দৌরাত্ম্য নেই। আবার ওরা বৈকুণ্ঠপুরের ঝিলে ফিরবে খুব ভোরে। সূর্যের আলো ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে। এই ওদের দৈনিক রুটিন।

সকালে আবিষ্কার হল ঝিলের পাশে ফাঁদে পাঁচটি পাখি বন্দী হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনটি যাযাবর পিন্‌টেল। সাবধানে বের করা হল পাখিগুলোকে। যাযাবর পাখিগুলোর পায়ে রিং পরিয়ে দিলেন মামাবাবু। সুনন্দ অসিত বঙ্কিমবাবু ছাড়াও গ্রামের অনেক লোক গভীর আগ্রহে দেখল তার কাজ। ডানকান তখন নিজের মনে ফোটো তুলতে ব্যস্ত।

ঘণ্টাখানেক পরে এক ব্যাপার দেখে সুনন্দরা হেসে অস্থির।–গ্রামের একটি লোক দুটো পায়রা এনে দিল বঙ্কিমবাবুকে। স্রেফ গোলা পায়রা। যারা গেরস্ত-বাড়ির ঘুলঘুলিতে বাস করে, কাছাকাছি মাঠে-ময়দানে চরে বেড়ায়। বঙ্কিমবাবু লোকটির হাতে একখানা নোট গুঁজে দিলেন। তারপর চুপিচুপি পায়রা দুটো থলিতে ভরলেন।

অসিত হেঁকে বলল, “কী হাজরা মশাই, রোস্ট খাবেন নাকি?

বঙ্কিমবাবু জিভ কাটলেন। আরে ছি ছি। বৈকুণ্ঠপুরে পক্ষিবধ! গ্রামের লোক মনে করবে কী? এই পায়রা দুটোকে আমি রিং পরাব। মানে প্র্যাকটিস করব।

মামাবাবু হেসে বললেন, আপনার রিং পরানোর ইচ্ছে আছে বলেননি কেন? দুটো হাঁস তো এমনি ছেড়ে দিলাম। সেগুলোকে পরাতে পারতেন।

লাজুক হেসে বঙ্কিমবাবু বললেন, ঠিক আছে। আগে একটু প্র্যাকটিস করে নিই; নিজের হাতে পরিয়ে দেখাব আপনাকে। পায়রা দুটো নিয়ে বঙ্কিমবাবু খোয়াইয়ের ঢালে নেমে অদৃশ্য হলেন।

প্রথম পায়রাটির পায়ে পরানো অ্যালুমিনিয়াম বলয় পরীক্ষা করে মামাবাবু বঙ্কিমবাবুকে সার্টিফিকেট দিলেন–গুড! কেবল আর একটু টাইট হবে। হ্যাঁ, পয়সা দিয়ে পায়রা কেনার দরকার নেই। আপনি বরং নদীর তীরে চলে যান। শ্রীমন্ত বলেছে, একজোড়া বালি-তিতির পড়েছে ফাঁদে। ওরা অবশ্য যাযাবর নয়, তবু ওদের ওপর হাত পাকাতে পারেন। রিং পরিয়ে ছেড়ে দেবেন। বঙ্কিমবাবু বেজায় খুশি হয়ে চলে গেলেন।

সুনন্দ দুপুরের খাওয়ার আয়োজন শুরু করল। সে রান্নায় ভারি পটু। অসিতকে বলল, ভানকান বাঙালি রান্না খাবে। খিচুড়ি, ডিম ভাজা, আলুর দম বানাচ্ছি।

সুনন্দকে ব্যস্ত দেখে অসিত বলল, একটু ঘুরে আসি।

মামাবাবু তখন ঝিলের ধারে চোখে দুরবিন লাগিয়ে বসে আছেন। ডানকান গ্রামে গেছেন একটা প্রাচীন মন্দির দেখতে।

অসিত যখন ফিরে এল, সুনন্দর রন্ধনপর্ব সমাপ্ত।

সুনন্দকে ফিসফিস করে বলল অসিত–হ্যাঁরে ভক্ত বঙ্কিমের মাথার গোলমাল নেই

সুনন্দ অবাক।–কই, মনে তো হয় না। কেন?

অসিত একটু চুপ করে থেকে বলল–আমার মনে হয় আছে।

হঠাৎ?

একটা উদ্ভট ব্যাপার দেখলাম, তাই।

নদী পেরিয়ে ওপারে গেলাম। খানিক ঘুরে বায়নোকুলার দিয়ে দেখলাম চারধার। তারপর গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লাম চিৎপটাং হয়ে। একটু বাদে পাশ ফিরেছি, চোখে পড়ল নদীর উল্টো তীরে ঝোঁপের আড়ালে বসে বঙ্কিমবাবু। তিনি–

হ্যাল্লো দেয়ার! ডানকানের গমগমে গলা শুনে দুজনে চমকে উঠল। ডানকান সাহেব পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন হাসি মুখে। এক কাপ কফি খাওয়াবে?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই-সুনন্দ তৎপর হয়ে ওঠে। ডানকান জুৎ করে বসলেন সামনের মোটা গাছের শিকড়ের ওপর। বোঝা গেল শুধু কফির তেষ্টা নয়, তার কিঞ্চিৎ আড্ডা দেওয়ার বাসনা জেগেছে।

জানো, খাবার-দাবার নিয়ে আমার কোনো বাছবিচার নেই। শুধু এই কফির ওপর একটু যা দুর্বলতা। এই যে ইচ্ছে করলেই কফি খেতে পাচ্ছি, এ যে কত বড় সৌভাগ্য সে তোমরা বুঝবে না। আমিও বুঝিনি আগে। প্রথম টের পেলাম উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার জঙ্গলে পথ। হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে। তখন কেবল গরম কফিতে চুমুক দেওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। নৌকাডুবি হয়ে আমার কফির প্যাকেট গেল ভেসে। তারপর পাক্কা চল্লিশ দিন কফি খেতে পাইনি।

ওখানে গিয়েছিলেন কেন? প্রশ্নটা দুজনের।

নাইজার নদীর গতিপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। বড্ড ভুগিয়েছিল সেবার।

কী-কীরকম?

স্যার ডেভিড কফিতে চুমুক দিতে দিতে তার অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি আরম্ভ করলেন। রুদ্ধশ্বাসে শোনে দুই বন্ধু। বঙ্কিমবাবুর অদ্ভুত আচরণের কথা আপাতত মুছে গেল তাদের। মন থেকে। কথাটা অবশ্য সুন্দর মনে পড়েছিল–তবে অনেক–অনেক পরে।

সেই রাতে কলকাতার বাসায় ফিরে, শুতে যাওয়ার আগে সুনন্দর মনে পড়ল–তাই তো, হরিধনের খবর পাওয়া গেছে কি? আর বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে কী একটা রহস্যময় ঘটনা বলতে যাচ্ছিল অসিত? কিন্তু রাত সাড়ে এগারোটার সময় কাউকে বিরক্ত করা উচিত নয়। পরদিন সুনন্দ কুণাল ও অসিতকে টেলিফোন করল।

কুণাল জানাল–হ্যাঁ, ফিরেছে হরিধন। খুব বেঁচে গেছে। আমি এখুনি আসছি তোর কাছে।

অসিত বলল–সত্যি, বঙ্কিমবাবুর ব্যাপারটা ভুলেই গেসলাম। অদ্ভুত লোক।আম কিছু মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। ফোনে বলা যাবে না সব গুছিয়ে। আমি যাচ্ছি। তবে একটু লাল হবে। কাজ আছে বাড়িতে।

.

০৪.

মিত্র কেমিক্যালস-এর সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হরিধনের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্পর্কে কুণাল যা বলল তার সারমর্ম এই–

হোটেল কুতুবের সামনে এক পার্কের বেঞ্চে বসে হোটেলের ওপর নজর রাখাছল হরিধন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মিস্টার বাসু এলেন ট্যাক্সিতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বেরিয়ে আসেন। ট্যাক্সি ডাকলেন না। পাইপ ধরিয়ে ধীরে সুস্থে হাঁটতে শুরু করলেন চৌরঙ্গীর দিকে।

সুবিধেই হল হরিধনের। অফিস-ফেরতা জনস্রোতে গা-ঢাকা দিয়ে সে হাত কুড়ি পিছনে থেকে বাসুকে অনুসরণ করল।

চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে অনেক রাস্তা ঘুরে বাসু ঢোকেন চীনে পট্টিতে। পথে একবার মাত্র থেমেছিলেন–দেশলাই কিনতে।

একটা সরু গলি। দুপাশে পুরনো আমলের বড় বড় বাড়ি। পথচারী কম। মিস্টার বাসু টপ করে এক বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেন। মিনিট পনেরো গলির মোড়ে অপেক্ষা করে হরিধনও ঢুকল সেই বাড়িতে।

সরু প্যাসেজ–দুধারে সার-সার ঘর। নোনা-ধরা ইট বের করা দেওয়াল। প্যাসেজে মিটমিট করছে বৈদ্যুতিক আলো। কোনো ঘর তালাবন্ধ। কোনোটা খোলা–মানুষজনের

কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ভিতরে। দু-চার জন লোক ঢুকছে বা বেরুচ্ছে। ঘরগুলোয় লোক বাস করে না। গুদাম বা অফিস হিসেবে ব্যবহার হয়। খোলা দরজা পেলেই ভিতরে। উঁকি দেয় হরিধন।

প্যাসেজের শেষ প্রান্তে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। হরিধনকে দেখছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হরিধন জিজ্ঞেস করল তাকে–একজনকে দেখেছেন যেতে? কোট-প্যান্ট পরা।

লোকটি আঙুল তুলে দেখাল-হ্যাঁ, ওই দিকে।

বাড়ির এ অংশ একেবারে নির্জন। হঠাৎ থামের আড়াল থেকে যেন মন্ত্রবলে আরি হল এক ব্যক্তি–দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, পরনে রঙচঙে লুঙ্গি ও শার্ট। চোখের নিচে হতে মহেব বাকি অংশ রুমাল বেঁধে ঢাকা।

মুহূর্তে সে হরিধনের বুকের ওপর উঁচিয়ে ধরল একখানা লম্বা ঝকঝকে ছোবা। কর্কশ স্বরে বলল–খবরদার, চেঁচালেই মরবি।

আর তখুনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হরিধনের ঘাড় পেছন থেকে দৃঢ়মুষ্টিতে আঁকড়ে গত কেউ। এবং আর একখানা হাত ভিজে কাপড়ের টুকরো সমেত তার মুখ চাপা দিল। ঝাঝাল মিষ্টি গন্ধ ঢুকল নাকে। হরিধনের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল এবং সে জ্ঞান হারান।

হরিধন যখন চেতনা পেল তখন বুঝতে পারল যে একটা দরজা-জানলা বন্ধ অন্ধকার ঘরে সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে শুয়ে রয়েছে। মুখও বাঁধা, গালের ভিতর কাপড় ঠাসা। চেঁচাবার উপায় নেই। ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো ঢুকছে।

দারুণ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার কাছে গেল হরিধন। দুম দুম্ করে জোড়া পায়ে লাথি মারতে লাগল কবাটে। বাইরে তালা খোলার আওয়াজ। সেই মুখ-ঢাকা লোকটা ঢুকল ঘরে। হিংস্রভাবে দাবড়ানি দিল–টু শব্দ করলে গলা কেটে পুঁতে ফেলব।

হরিধন ইঙ্গিতে বোঝাল–জল।

লোকটা এক মগ জল এনে হরিধনের বাঁধন খুলল। হরিধন হাঁ করতে ঢেলে দিল জলটুকু। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দরজায় তালা দিল। দরজার বাইরে আলো। দেখে হরিধনের মনে হয়েছিল তখন সকালবেলা।

খানিকক্ষণ পরে তার কানে এল দরজার বাইরে দুজন লোকের কথাবার্তা।

ফেউটাকে নিয়ে কী করব স্যার?

দেখি ভেবে।

খতম করে পাচার করে দিই। ঝামেলা চুকে যায়।

উহুঁ ব্যস্ত হয়ো না। আমি আসছি ঘুরে।

একজনের গলা চিনেছিল হরিধন–মুখ-ঢাকা গুণ্ডাটা। দ্বিতীয় জনকে চিনতে পারেনি।

ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল হরিধন। আর কোনো শব্দ করতে সাহস পায়নি। ঘণ্টার পর ঘন্টা ঠায় একভাবে পড়ে থেকে তার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

আবার দরজা খুলল সেই গুণ্ডাটা। তখন নিশুতি রাত। হরিধনের মুখ খুলে দিয়ে এক গ্লাস দুধ দিল তাকে খেতে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। তাই বিনা আপত্তিতে দুধটুকু খেয়ে ফেলল হরিধন। একটুক্ষণ পরেই তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। অবশ অচেতন হয়ে পড়ল তন্দ্রায়।

কণাল বলল, ভোরবেলা হরিধনের দেহ আবিষ্কার হল। ওই বাড়িরই এক নোংরা উঠানে। প্রথমে লোকে ভেবেছিল মৃত। তারপর বুঝল অজ্ঞান। তখন ওকে হাসপাতালে পাঠাল। পরে ওর জ্ঞান হল। ডাক্তার বলেছে কড়া ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল।

কিছু খোয়া গেছে হরিধনের? জিজ্ঞেস করল সুনন্দ।

হুঁ। ওর মনিব্যাগ এবং রিস্টওয়াচ। পুলিশ ওই বাড়ি সার্চ করেছে। কিন্তু হরিধনের আততায়ীর সন্ধান পায়নি। এমনকি কোন ঘরে বন্দী ছিল তাও ঠিক করে বলতে পারেনি হরিধন। কয়েকজনকে জেরা করে আপাতত হাল ছেড়ে দিয়েছে। কী করতে হরিধন ওই বাড়িতে ঢুকেছিল তার আসল কারণ অবশ্য পুলিশের কাছে চেপে গেছি। কে জানে, তাহলে হয়তো আমাদেরই অযথা হয়রানি করত পুলিশ।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে কুণাল বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় এ অর্ডিনারি ছিনতাই কেস নয়। মিস্টার বাসুই গুণ্ডা লাগিয়েছিল।

তোর ধারণার কারণ?

কারণ হরিধনের প্যান্টের পকেটে একটা চিঠি ছিল, সেটা উধাও হয়েছে। এমনি অফিস চিঠি। অফিসিয়াল প্যাডে আমি লিখেছিলাম হরিধনকে কিছু কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে। আমার সই ছিল তাতে। এ চিঠি সাধারণ গুণ্ডা নেবে কী করতে? তাছাড়া ওকে ফেউ বলাছল

হতে পারে। বাসু সন্দেহ করেছিল ওকে ফলো করা হচ্ছে, তাই। লোকটা তাহলে ডেনজারাস–

সদর দরজার কলিং বেল বাজল।

দরজা খুলে সুনন্দ দেখে বঙ্কিমবাবু।

বঙ্কিমবাবু বললেন, “নমস্কার। প্রফেসর ঘোষ আছেন?

না, বেরিয়েছেন। আপনি বসুন। ফিরবেন এবার।

ডানকান সাহেব কি চলে গেছেন?

হ্যাঁ।

ওঃ দুর্দান্ত লোক মশাই। এই প্রথম স্বচক্ষে একজন পর্যটককে দেখলাম। বইয়ে পড়েছি। কত।

সুনন্দ জবাব দিতে যাচ্ছিল–কেন, মামাবাবু? কিন্তু তার নজরে পড়ল বঙ্কিমবাবু হা করে চেয়ে আছেন বৈঠকখানার খোলা দরজা দিয়ে কুণালের দিকে।

সুনন্দ বলল, আমার বন্ধু কুণাল মিত্র।

ও, ইনিই বুঝি মিস্টার বাসুর খোঁজ করছিলেন? চাপা গলায় বললেন বঙ্কিমবাবু।

“না না, সে অন্য লোক।

ওঃ সরি। আচ্ছা আমি এখন চলি। পরে আসবখন। নমস্কার।

দরজা বন্ধ করে এসে সুনন্দ বলল, কুণাল, ভদ্রলোক কী বলছিলেন জানিস?

কী?

ইনিই কি মিস্টার বাসুর খোঁজ করছেন?

অ্যাঁ! কুণাল আঁতকে ওঠে।

ভয় নেই। আমি বলেছি সে অন্য লোক। সুনন্দ আশ্বাস দিল।

কে ভদ্রলোক?

বাবু বঙ্কিম হাজরা। মামাবাবুর চেলা। লোক খারাপ নয়, তবে মগজ কিঞ্চিৎ নিরেট।

সত্যি, বোকা লোকগুলো এক-একসময় এমন বেফাঁস কথা বলে ফেলে!

.

কুণাল বিদায় নেবার ঘণ্টাখানেক পরে এল অসিত।

সুনন্দ অসিতকে সংক্ষেপে জানাল হরিধনের অন্তর্ধান-কাহিনি। তারপর বলল, বল শুনি, বঙ্কিমবাবুর রহস্যময় আচরণ সম্বন্ধে কী জানি বলছিলি?

অসিত বলতে শুরু করে–কোপাই নদীর তীরে গাছতলায় শুয়ে আছি। খানিক পরে কাৎ হয়ে দেখি, অন্য পাবে ঝোঁপের আড়ালে বঙ্কিমবাবু। আমার দিকে একটু পাশ ফিরে বসেছেন। তার হাতে একটা পাখি,–তিতির। আমি ভাবলাম পাখিটাকে রিং পরাবেন, তাই কৌতূহল নিয়ে তাকিত রইলাম।

উনি কিন্তু কী করলেন জানিস? ব্যাগ থেকে ছোট একটা শিশি বের করলেন। তারপর আঙুল শিশির মধ্যে ঢুকিয়ে কী জানি তুলে পাখিটার ঠোঁটে, মুখে, ডানায়, পায়ে ঘষে দিতে লাগলেন। বারবার এমনি করলেন। এমনকি সেটা খাওয়ানোর চেষ্টাও করলেন। আমি তো হাঁ। করছেন কী? এরপর তিনি তিতিরটা উড়িয়ে দিলেন।

রিং পরালেন না? প্রশ্ন করল সুনন্দ।

না। আমি দুরবিন ফোকাস করে লক্ষ করেছি। রিং দেখতে পাইনি পাখির পায়ে। বঙ্কিমবাবু এরপর আর একটা তিতির নিলেন হাতে। এবং আগের মতোই উদ্ভট কাণ্ড করে সেটাকেও ছেড়ে দিলেন।

রিং?

উঁহু, তার পায়েও রিং ছিল না। বঙ্কিমবাবু এরপর চলে গেলেন উঠে। শিশিটা ফেলে দিয়ে গেলেন একটা গর্তে। আমি পরে গিয়ে শিশিটা তুলে নিলাম। কিন্তু শিশিতে যে কী ছিল ধরতে পারছি না।

কই দেখি শিশিটা।

অসিত পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি বের করল। চ্যাপ্টা ক্রিমের শিশির মতো সাইজ। স্বচ্ছ কাঁচের তৈরি। প্লাস্টিকের ঢাকনা–তাতে সূক্ষ্ম কয়েকটি ছিদ্র। শিশির ভিতরে কাঁচের গায়ে পাতলা সরের মতো কী জানি লেগে রয়েছে জায়গায় জায়গায়।

সুনন্দ শিশিতে নাক লাগিয়ে শুকল। কেমন বোটকা গন্ধ। চোখের কাছে এনে পরীক্ষা করল। কিন্তু ভিতরে যে কী বস্তু ছিল আন্দাজ করতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, “কী ছিল এতে? আশ্চর্য! এটা কী লেগে আছে?

জানিস, এই শিশিটা আমি আগেও একবার দেখেছিলাম। বলল অসিত।

কখন?

সেই যখন বাঁদরে বঙ্কিমবাবুর জিনিস ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল। আমি তার জিনিস খুঁজতে খুঁজতে এই শিশিটা পাই। ওটা হাতে পেয়ে একটুক্ষণ লক্ষ করেছিলাম। ঢাকনা খুলিনি। তখনও কিন্তু মনে হয়েছিল শিশিটা প্রায় খালি শুধু অল্প ক্রিম জাতীয় কী বস্তু রয়েছে ভিতরে।

দুই বন্ধু হতভম্ব হয়ে বসে থাকে শিশিটার দিকে তাকিয়ে।

সুনন্দ বলল, “আমি তো ভাই কিছু কূল পাচ্ছি না।

আমিও না।

একটা কাজ করব?

কী?

মামাবাবুকে বলি ব্যাপারটা। উনি যদি কোনো ক্লু—

হুঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম। তুই রাখ শিশিটা। মামাবাবুকে দেখাস।

তবে মামাবাবু পাখি নিয়ে যা মেতে আছেন। হয়তো কানেই তুলবেন না। দেখা যাক।

বিকেলে মামাবাবুর স্টাডিতে ঢুকল সুনন্দ। সামান্য ইতস্তত করে বলে ফেলল বঙ্কিমবাবুর শিশি-রহস্য।

মামাবাবু শিশিটা দেখলেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। বললেন-বেশ, দেখব পরীক্ষা করে। তবে তোমাদের বোধহয় নিরাশ হতে হবে। হয়তো শুনবে নেহাত ছেলেমানুষী ব্যাপার।

মামাবাবুর হাতে ওই শিশি তুলে দেওয়ার তিন দিন পরের ঘটনা।

সবে ব্রেকফাস্ট সেরে পড়ার টেবিলে এসে বসেছেন প্রোফেসর ঘোষ অর্থাৎ মামাবাবু। সামনে মুখোমুখি বসে সুনন্দ ও অসিত। টেবিলের ওপরে রাখা বঙ্কিমবাবুর সেই রহস্যময় শিশি।

এই শিশিতে কি ছিল জান? বললেন মামাবাবু।

কী?

একরকম ব্যাকটিরিয়া। জীবাণু।

সে কী!! মহা বিস্ময়ে অসিত ও সুনন্দ হতভম্ব। কীসের? প্রশ্ন করল তারা।

একে একে বলছি। মামাবাবু শিশিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, প্রথমে আমি শিশির ভিতরে কাঁচের গায়ে লাগা আঠাল বস্তু একটু নিয়ে স্লাইডসয়ে লাগিয়ে মাইক্রোস্কোপের তলায় পরীক্ষা করি, এবং একরকম ব্যাকটিরিয়ার অস্তিত্ব আবিষ্কার করি। ওই বস্তু বারবার বিশ্লেষণ করলাম নতুন করে নিয়ে। প্রত্যেক বারই পেলাম সেই একই জাতের ব্যাকটিরিয়া–প্রচুর পরিমাণে। অবাক হলাম। বুঝলাম, ওই সরের মতো আঠাল বস্তু কোনো কালচার মিডিয়া। এবং তার মধ্যে এই ব্যাকটিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এ-জীবাণু যে কী জাতীয় বুঝে উঠতে পারলাম না।

কালচার মিডিয়া কী? প্রশ্ন করল অসিত।

মামাবাবু জবাব দিলেন, একরকম রাসায়নিক পদার্থ। ল্যাবরেটরিতে যার মধ্যে জীবাণুকে কালচার অর্থাৎ পালন করা হয়।

হ্যাঁ, তখন গেলাম মাইক্রোবায়োলজিস্ট ডক্টর আয়ারের কাছে। জীবাণু নিয়েই তার গবেষণা। ডক্টর আয়ারও ধরতে পারলেন না। তিনি আমায় নিয়ে গেলেন আর একজন বিশেষজ্ঞের কাছে–কৃষিবিজ্ঞানী ডক্টর সাহা।

ডক্টর সাহারও বেশ সময় লাগল জিনিসটা কী সেটা বুঝতে। তারপর যা রিপোর্ট দিলেন সেটা অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য।

ডক্টর সাহা বলেছেন–এই ব্যাকটিরিয়া হচ্ছে গমের নেতানো রোগের কারণ। গমের পাতা ও শিষের নরম অংশের কোষ থেকে এই জীবাণু খাদ্য আহরণ করে। ফলে পুষ্ট গাছ যায় শুকিয়ে। সাহা বলেছেন–এই গমের রোগ ভারতবর্ষে একেবারে নতুন। কৃষিবিজ্ঞানীরা এ-রোগ নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু এখনো এর প্রতিরোধের কোনো উপায় বের হয়নি।

ডক্টর সাহা ভেবেছিলেন, কেউ বুঝি এই ব্যাকটিরিয়া নিয়ে রিসার্চ করছে। তিনি তার নাম জানতে চাইছিলেন।

গমের নেতানো রোগ। সুনন্দ লাফিয়ে ওঠে।

ঠিক এই রোগের ওষুধের ফরমুলা তো বিক্রি করতে চাইছেন মিস্টার বাসু।

কে মিস্টার বাসু? মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

সুনন্দ ও অসিত পালা করে বলে গেল মিস্টার বাসুর কাহিনি–একেবারে শুরু থেকে। কুণালের কাছে গত বছর রহস্যময় মিস্টার বাসুর চিঠি–ফরমুলা বিক্রির প্রস্তাব–কুণালের সন্দেহ–প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের খোঁজে তাদের বারবার অভিযান এবং ব্যর্থতা—সমস্ত খুটিনাটি।

মামাবাবু ভুরু কুঁচকে শুনে গেলেন আগাগোড়া। সুনন্দদের বর্ণনা শেষ হলে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "বটে বটে। শোনো, আমি কুণালের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওকে আসতে বলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আধঘণ্টার মধ্যেই কুণাল হাজির হল।

মামাবাবু কুণালকে মিস্টার বাসুর ধরন-ধারণ ও তার ফরমুলাগুলি সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ধানের রাক্ষুসে পোকা বা গমের নেতানো রোগের ইতিহাসও জেনে নিলেন। সব শুনে গুম মেরে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। অতঃপর সুনন্দকে ছক দিলেন–বঙ্কিমবাবুর বাড়ি যাও। ওনাকে ডেকে আনো আমার কাছে। তবে এ-ব্যাপারে কিছু ফাঁস কোরো না। বলবে, আমি বার্ড-ওয়াচিংয়ে বেরোচ্ছি। তাই ওঁর সঙ্গে প্রোগ্রাম করতে চাই।

বঙ্কিম হাজরার এন্টালির বাসায় আগে যায়নি সুনন্দ। ঠিকানা খুঁজে বের করল। মস্ত পাঁচতলা বাড়িতে তিন কামরার এক ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করেন বঙ্কিমবাবু। নিজের বাড়ি নয়, ভাড়া।

দুঃখের বিষয় ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলছে।

দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে সুনন্দ জানল, বঙ্কিমবাবু কলকাতার বাইরে গেছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

সুনন্দর রিপোর্ট পেয়ে মামাবাবু আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরের দিন তিনি কোথায় কোথায় জানি ঘুরলেন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেই সুনন্দকে ডেকে বললেন, কাল ভোরে তোমাদের বন্ধু তপন দত্তর সঙ্গে দেখা করতে যাব। অসিতকেও নিয়ে চলো।

মানে সুরভি নার্সারি?

হুঁ। এই তপন দত্তর পরিচয় জানো? জান ওর ইতিহাস?

কেন, তপন কী করেছে?

ঠিক কী করেছে সেটাই জানতে চাই। যেটুকু জানতে পেরেছি তপন দত্ত ছিল প্রোফেসর তালকদারের রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট। বহুদিন কাজ করেছে ডক্টর তালুকদারের ল্যাবরেটরিতে। তালুকদার একবার তপন সম্বন্ধে ডক্টর সাহার কাছে খুব প্রশংসাও করেছিলেন।

ডক্টর তালুকদার মানে বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, যিনি বছর চারেক আগে আমেরিকায় ভিজিটিং প্রোফেসর হয়ে গিয়ে হঠাৎ মারা যান হার্ট অ্যাটাকে?

হ্যাঁ। ওঁর অকালমৃত্যুতে দেশের মস্ত ক্ষতি হয়েছে। ডক্টর তালুকদারের সাবজেক্ট ছিল মানুষের খাদ্যশস্য ও ফলমূলের নানান ক্ষতিকারক রোগের কারণ অনুসন্ধান এবং তাদের প্রতিরোধ করার উপায় আবিষ্কার। এই মানুষের কাছে যে অনেক দিন কাজ করেছে সে এসব রোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে বলেই আমার ধারণা।

.

সুরভি নার্সারির রূপ এর মধ্যে বিশেষ পালটায়নি। শুধু দেখা গেল প্রধান বাড়ি। দরজা-জানালা সব বন্ধ।

।মামাবাবুর সঙ্গে সুনন্দ ও অসিত নার্সারির গেট খুলে ঢুকতে চেনা সেই মালিটি এগিয়ে এল।

তপনবাবু আছে? জিজ্ঞেস করল সুনন্দ।

আজ্ঞে না। বাইরে গেছেন।

কোথায়?

আজ্ঞে জানি না।

থমকে গেল তিনজনে। এ-সম্ভাবনা কারো মনে জাগেনি। অসিত প্রশ্ন করল–কবে ফিরবেন?

তা জানি না হুজুর।

মামাবাবুর মুখের দিকে তাকাল ওরা, এবার কী করা?

মামাবাবু মালিকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কাছে চাবি আছে বাড়ির?

মালি একটু ইতস্তত করে বলল–আছে।

শোনো আমরা এই বাড়ির ভিতরটা দেখতে চাই।

ভয়মাখা চোখে মালি বলল, "আজ্ঞে, হুকুম নেই। বাবু বকবেন।

কোন্ বাবু?

বাসু সাহেব।

ও, বাসু সাহেবের সঙ্গে বুঝি গেছে তপনবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার নাম কী?

আজ্ঞে, বলরাম।

কদ্দিন আছ এখানে?

আজ্ঞে তিন বছর। নার্সারি খোলর গোড়া থেকে।

বাড়িতে আর কেউ আছে?

না। রাঁধুনি আর ধ্রুব মালি বাড়ি গেছে।

মামাবাবু বেশ অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, শোনো বলরাম, আমি খবর পেয়েছি এই নার্সারি বিক্রি করে দেওয়া হবে। আমি নার্সারিটা কিনব ভাবছি। ঘরগুলো একটু দেখতে চাই। নইলে বুঝব কী করে কত দরে পোষাবে। অনেক দূর থেকে এসেছি। এজন্যে বারবার আসা অসুবিধে। তুমি একটু ইচ্ছে করলেই কাজটা আজ চুকে যায়। ভয় নেই বাসু সাহেব বা কেউ জানতে পারবে না একথা। এই নাও রাখো এটা, ছেলেদের মিষ্টি কিনে দিও। মামাবার মানিব্যাগ থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে বলরামের নাকের সামনে ধরলেন।

বলরামের সসেমিরা অবস্থা। তক্ষুনি হাত বাড়াল বটে, কিন্তু লোভী জুলজুল চোখে দেখতে লাগল।

মামাবাব উৎসাহ দিলেন, "আরে কোনো ভয় নেই। তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। একটিবার ঘুরে দেখে নেব। কোনো জিনিস নেব না। হ্যাঁ, নার্সারি যদি কিনি তোমাকে আমার চাই। তোমার মতো পাকা লোককে ছাড়ছি না। মাইনে এখন যা পাও তাতেই হবে তো? ঠিক আছে, তখন দেখা যাবে।

ব্যস ওতেই কেল্লা ফতে। বলরাম একগাল হেসে ঘাড় নাড়ল এবং নোটটি টেনে ট্যাঁকে গুঁজে বলল, আসুন বাবু।

বাড়িতে নিচের তলা সুনন্দরা আগে যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনি রয়েছে—গুদাম, অফিস, বীজ পরীক্ষার সামান্য আয়োজন।

দোতলার সিঁড়ির মুখে তপনের শোওয়ার ঘর। তক্তপোশ খালি। কোনো বাক্স-প্যাঁটরা বা বিছানার চিহ্ন নেই। কেবল বুকসেলফে কতকগুলো ইংরেজি-বাংলা বই ও পত্রিকা। প্রায় সবই কৃষি বা রসায়ন বিদ্যার।

দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে তিনজনে থ।

এ যে পুরোদস্তুর ল্যাবরেটরি!

বেশ বড় ঘর। দুধারে লম্বা টেবিল-লাগোয়া র‍্যাক। টেবিলে গ্যাসবার্নার। টেবিল ও র‍্যাকে রকমারি মাপের শিশি-বোতল, টেস্টটিউব, বিকার, বকযন্ত্র প্রভৃতি গবেষণার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। কাঁচ বা প্লাস্টিকের পাত্রে নানা রঙের চূর্ণ তরল পদার্থ, শস্যদানা, শুকনো পাতা ইত্যাদি। কোনোটা বা খালি। তবে বোঝা যায় এই গবেষণাগার গত কিছুদিন যাবৎ ব্যবহার করা হয়নি। কেমন এলোমেলোভাবে ছড়ানো জিনিসগুলো। ধুলো জমেছে। কয়েকখানা কাঁচের স্লাইড রয়েছে টেবিলে, কিন্তু মাইক্রোস্কোপ নেই। বড় আলমারি

রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে। তাতে নিচের তাকে কয়েকটা খালি শিশি। ওপরের তাক সব ফাঁকা।

মামাবাবু টেবিল থেকে একটা শিশি তুলে নিলেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যে শিশিটা পাওয়া গিয়েছিল অবিকল সেরকম। আরও চার-পাঁচটা শিশি রয়েছে। অসিত তাকাল সুনন্দর। পানে। চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দিল–যে বৈজ্ঞানিকের খোঁজে তাদের অ্যাডভেঞ্চার শুরু, এতদিনে বুঝি তার হদিস মিলল। কিন্তু এত লুকোচুরির কারণ কী?

সুরভি নার্সারির বাড়িঘর বাগান ইত্যাদি ঘুরে দেখে ঘণ্টাখানেক পরে সকলে বিদায় নিলেন।

ট্রেনে মামাবাবু প্রায় কথাই বললেন না। কপালে চিন্তার ভাঁজ। সুনন্দরা তাকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। এরকম মুডে থাকলে মামাবাবু কথাবার্তা পছন্দ করেন না। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছাল তখন বিকেল প্রায় তিনটে।

ট্রেন থেকে নেমেই মামাবাবু বললেন, পানিহাটি চলো। বঙ্কিমবাবুর সেই বাগানবাড়ি।

এখনই?

হুঁ। সময় নষ্ট করা চলবে না। অলরেডি লেট।

মামাবাবর স্বভাব এমনি। একবার ঝোঁক চাপলে নাওয়া-খাওয়া চুলোয় যায়। সুনন্দ অসিতও উত্তেজিত। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি ক্রমে যেন একটি সূত্রে বাঁধা পড়ছে। ঘটনাপ্রবাহ ছুটে চলেছে কোন রহস্যময় পরিণতির দিকে, কে জানে?

পানিহাটির বাগানবাড়ি আগের মতোই নিস্তব্ধ। গেট খুলে ভিতরে ঢুকল তিনজনে। সুনন্দ অসিত লক্ষ করল গেট থেকে বাড়ি অবধি পথ চেঁছে পরিষ্কার করা হয়েছে। বাগানও আগের তুলনায় ছিমছাম। বঙ্কিম হাজরা কি বাড়ি আছেন? থাকার কথা নয়। কলকাতার বাইরে গেছেন। তাহলে, এখানে কী করতে এসেছেন মামাবাবু?

সদর দরজার কাছাকাছি পৌঁছে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে কারো দেখা পাবার আশায়। গেট খোলার শব্দ হল। এক ভদ্রলোক ঢুকলেন বাড়িতে। সন্দিগ্ধ চোখে দেখতে লাগলেন তাদের। লম্বা শুটকো, টাক মাথা, নাকের ডগায় চশমা-ঝোলা এক বৃদ্ধ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে শৌখিন লাঠি।

কী চাই? তীক্ষ্ম সুরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

নমস্কার। বঙ্কিমবাবু আছেন? মানে শ্রীবঙ্কিম হাজরা। বললেন মামাবাবু।

এখানে কোনো হাজরা-ফাজরা থাকে না। আমি থাকি। আমার নাম শ্রীদোলগোবিন্দ ঢোল।

ও। কিন্তু তিনি ছিলেন আগে। আমরা এসেছি একবার,বলল সুনন্দ।

হতে পারে। কত লোকই তো ছিল এখানে। একশো বছরের বাড়ি। আমি ছ-মাস হল ভাড়া নিইচি।

বঙ্কিমবাবু কোথায় থাকেন জানেন? জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু।

“আজ্ঞে না।

“আচ্ছা সেই পুরনো মালি আছে? সে হয়তো বলতে পারে।

ও, সেই আপিংখোর বুড়ো। তাকে ছাড়িয়ে দিইচি। বলল, পুরনো লোক তাই রেখেছিলাম গোড়ায়। দেখি, বেটা অকম্মার ঢেঁকি। কেবল বসে বসে ঝিমোয়। ওকে কী কত্তে যে পুষেছিল মাইনে দিয়ে?

অগত্যা তিনজনে ফিরে চলল।

দোলগোবিন্দ অতি অভদ্র। গেট অবধি পৌঁছে তো দিলই না, বরং পেছন থেকে খনখনে গলায় হেঁকে বলল, "ও মশাই, গেটটা বন্ধ করে যাবেন। নইলে গরু-ছাগল ঢুকবে।

ট্যাক্সিতে মামাবাবু চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইলেন। একবার কেবল বলে উঠলেন, বুঝলে হে, তিনটে শয়তান ক্রিমিনাল। একসঙ্গে চক্রান্ত করেছে। অথচ বাইরে থেকে তাদের প্রায় যোগাযোগই নেই। কাউকে ধরাছোঁয়া যাবে না। চমৎকার প্ল্যান।

মামাবাবু দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন, "বেশ দেখা যাক, কদ্দুর দৌড়। যেন তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন ওই তিনজনের উদ্দেশে।

.

০৫.

দিনান্তে সন্ধ্যার আগমনে কলকাতা শহরের চৌরঙ্গী অঞ্চলের পথ-ঘাট দোকান-পাট ঝলমল করে উঠল নানা রঙের বৈদ্যুতিক আলোর বন্যায়।

এই চৌরঙ্গীর বিলাসবহুল প্রিন্স হোটেলের সামনে একটু ট্যাক্সি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামলেন এক ব্যক্তি–নিখুঁত সাহেবি পোশাকে সজ্জিত, একটু সামনে ঝোকা কজো ধরন,

দাঁতে কামড়ানো পাইপ, হাতে একটি ব্রিফকেস। এই ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পাঠক আগেও কয়েকবার পেয়েছেন। ইনি মিস্টার বাসু।

মিস্টার বাসু গটগট করে ঢুকলেন হোটেলে। রিসেপসনিস্টের কাছে গিয়ে বললেন, মিস্টার কার্পেন্টারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কুড়ি নম্বর সুইট।

আপনার নাম? জানতে চাইল রিসেপসনিস্ট মেয়েটি।

মিস্টার বি বাসু।

আঃ, মিস্টার বাসু। ইউ আর ওয়েলকাম। আপনি সোজা চলে যান কুড়ি নম্বরে। মিস্টার কার্পেন্টারের নির্দেশ আছে আপনি এলেই পাঠিয়ে দিতে। আমি ফোনে ওনাকে আপনার খবর দিচ্ছি।

কুড়ি নম্বর ঘরের বেল টিপলেন মিস্টার বাসু।

আপনি কি মিস্টার বাসু? দরজা খুলে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন এক লম্বা ফর্সা সুদর্শন প্রৌঢ়।

ইয়েস।

গুড ইভনিং। আমি কার্পেন্টার। তিনি সাদরে করমর্দন করলেন বাসুর সঙ্গে। আজান জানালেন, দয়া করে ভিতরে আসুন।

চেয়ারে বসলেন বাসু। লক্ষ করে দেখলেন মিস্টার কার্পেন্টারকে। ভদ্রলোকের চোখে-মুখে প্রখর বুদ্ধির ছাপ। তবে কথা বা ভাবভঙ্গি বেশ সহজ। ভারত কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের মতো বড় ওষুধ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আরও ভারিক্কি জাঁদরেল-দর্শন হবেন বলে তিনি আশা করেছিলেন।

আপনার ফরমুলার কাগজ-পত্র এনেছেন? আর সলিউশনের সাল? মিস্টার। কার্পেন্টার কথা বলছিলেন চোস্ত ইংরেজিতে।

হ্যাঁ।–মিস্টার বাসু ব্রিফকেস খুললেন। একতাড়া টাইপ করা কাগজ বের করলেন এবং ছোট একটি শিশি। শিশি ভর্তি কোনো তরল পদার্থ। কাগজ ও শিশি রাখলেন সামনের টেবিলে।

এবার আপনার দর বলুন মিস্টার বাসু।

সামান্য ইতস্তত করলেন বাসু। বললেন, আগে পেপারস পরীক্ষা করুন। সলিউশন টেস্ট করুন। তারপর না হয় দর-দাম নিয়ে কথা হবে।

পরীক্ষা করা হবে বইকি! কিন্তু ওসব হচ্ছে স্রেফ ফরম্যালিটি। আমি জানি আপনার ফরমুলা খাঁটি। কাজেই আসল কথাবার্তা যত তাড়াতাড়ি এগোয় ততই ভালো।

একটুক্ষণ চুপ করে, ভেবে বাসু বললেন, মাই প্রাইস ইজ টুয়েন্টি-ফাইভ থাউজেন্ড। রয়ালটি চাই না। পেটেন্ট রাইট আপনাদের দিয়ে দেব।

দ্যাটস অল রাইট। কোম্পানির এক্সপার্টকে পেপারস এবং সলিউশন পরীক্ষা করিয়ে আশা করছি দু-সপ্তাহের মধ্যে আমরা ফাইনাল এগ্রিমেন্ট করে ফেলতে পারব।

মিস্টার বাসুর ভাব দেখে মনে হল যে কার্পেন্টার এত সহজে রাজি হয়ে যাবে তিনি ভাবেননি।

লেট আস সেলিব্রেট। ড্রিঙ্কস? অথবা চা-কফি?

থ্যাঙ্ক-য়্যু। কফি।

মিস্টার কার্পেন্টার বেয়ারাকে ডেকে কফির অর্ডার দিলেন।

কফি খেতে খেতে কার্পেন্টার বললেন, "আচ্ছা মিস্টার বাসু রিসার্চের খরচ নিশ্চয় অনেক?

হ্যাঁ।

আপনার বোধহয় অনেক টাকা?

মোটেই না।

একটা কথা বলি, যদি আপনাকে আমাদের কোম্পানির রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের ভার নিতে অনুরোধ করি, রাজি আছেন? আপনি কত মাইনে চান বলুন, হোয়াটস ইওর প্রাইস?

সরি। আপনার অফার আমি গ্রহণ করতে পারলাম না, জানালেন মিস্টার বাবু।

মিস্টার বাসু বুঝলেন এই কারণেই জোনাল ম্যানেজারের বদলে ম্যানেজিং ডিরেক্টম স্বয়ং আজ তার সঙ্গে দেখা করেছেন। ভারত কেমিক্যালসকেই তিনি গত বছর ধানের রাক্ষুসে পোকা মারার ওষুধের ফরমুলা বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু সেবার তার সঙ্গে ব্যবসায়িক কথা বলেন জোনাল ম্যানেজার মিস্টার গুরদেব সিং। এবার এই কোম্পানিকে গমের নেতানো রোগের জীবাণুনাশক ওষুধের ফরমলা বিক্রির প্রস্তাব দিতে জোনাল ম্যানেজারের উত্তর আসে স্বয়ং ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার সঙ্গে কথা বলবেন এ-বিষয়ে।

তিনি যেন মিস্টার কার্পেন্টারের সঙ্গে এই হোটেলে দেখা করেন। সাক্ষাতের সময় নির্দেশ করা ছিল চিঠিতে।

চিঠি পেয়ে বেশ অবাক হয়েছিলেন বাসু। এবার বোঝা গেল হেতু।

মিস্টার কার্পেন্টার হাসলেন, আমি জানতাম আপনি রাজি হবেন না। বৈজ্ঞানিকরা কারো অধীনে কাজ করতে চান না বড়। অবশ্য এতে আপনার লোকসান হত না। বরং উভয়পক্ষের লাভ। আপনাকে গবেষণার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সুযোগ দিত কোম্পানি।

নো। ভেরি সরি। ঘাড় নাড়লেন বাসু।

"ঠিক আছে। আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। আমার প্রস্তাব দিলাম। এখন আপনার অভিরুচি। যদি মত পরিবর্তন করেন, আমায় জানাবেন।

কফি খেতে খেতে স্যাম্পলের শিশিটা নাড়াচাড়া করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যান কার্পেন্টার। মিস্টার বাসু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করেন। মিস্টার কার্পেন্টার বুঝতে পারেন। অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললেন, "আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। এক বিরাট আশাভরা স্বপ্ন।

কী স্বপ্ন, শুনতে পারি?

আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আমার স্বপ্ন আর আপনার মতো বৈজ্ঞানিকের স্বপ্নের প্রকৃতি আলাদা। আমার স্বপ্ন, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমার ব্যবসাকে ঘিরে।

মিস্টার বাসু জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকেন।

কার্পেন্টার বলে চলেন, আমি ভাবছিলাম এই সলিউশন আমাদের কোম্পানিকে নিশ্চয় লাভ এনে দেবে। কিন্তু তা আর কতটুকু? এমনি আরও কয়েকটা আশ্চর্য প্রোডাক্ট যদি বাজারে ছাড়তে পারতাম। তাহলে-ওঃ, কী বিপুল লাভ! ভারত কেমিক্যালসের চেহারা পালটে যেত। সারা দুনিয়ায় তার নাম ছড়িয়ে পড়ত।

মিস্টার বাসু হেসে বললেন, অর্থাৎ প্রথমে ঘটা চাই ফসলের মহামারী। তারপর চাই তাদের প্রতিরোধক ওষুধ। তবে আপনার স্বপ্ন সার্থক হবে। তাই না?

তা বটে। হতাশভাবে মাথা নাড়েন কার্পেন্টার। আমার স্বপ্ন একটু অবাস্তব মানছি। তবু ভাবি যদি তা সম্ভব হত–তিনি কেমন যেন উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকেন মিস্টার বাসুর চোখে।

মিস্টার বাসু চোখ সরিয়ে নিলেন। মাথা নিচু করে চিন্তা করলেন কী জানি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, মিস্টার কার্পেন্টার, বৈজ্ঞানিক যেমন রোগ দমন করার উপায় আবিষ্কার করে, তেমনি সে ইচ্ছে করলে রোগের বীজও তৈরি করতে পারে।

কার্পেন্টার তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠেন, মিস্টার বাসু, আমি জানি বিজ্ঞানের ক্ষমতা সীমাহীন। আমি জানি, আপনি ইচ্ছা করলে মানুষের খাদ্য ফসল ধ্বংসের জীবাণু আবিষ্কার করতে পারেন এবং সেই জীবাণুকে রোধ করার ওষুধ। কি, পারেন না? সত্যি করে বলুন?

হয়তো পারি। মৃদু কণ্ঠে জবাব আসে।

তাহলে দিন আমাদের। অন্তত একটা কোনো জুৎসই শস্য রোগের জীবাণু। আর তাকে প্রতিরোধ করার ওষুধ। ভারত কেমিক্যালস আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যথাযোগ্য মূল্য দিতে প্রস্তুত।

বুঝলাম। কিন্তু আমি নিঃসঙ্গ বৈজ্ঞানিক। আপনি যে বিরাট এলাকা জুড়ে ব্যবসার কথা ভাবছেন, এইসব জায়গায় মাঝে মাঝে চাষের ক্ষেতে ওই রোগের বীজকে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই।

লোকবল আপনার না থাক আমার আছে। কার্পেন্টার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, ভারত কেমিক্যালসের টাকা বা অনুগত বিশ্বাসী কর্মচারীর অভাব নেই। আপনি শুধু অস্ত্রটি আমার হাতে তুলে দিন। বিকট উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তিনি।

আচ্ছা, রোগটা কোন্ শস্য নষ্ট করবে? জিজ্ঞেস করলেন কার্পেন্টার।

ধান।

রোগ সৃষ্টির কারণ কী হবে? পোকা না জীবাণু?

পোকা বা জীবাণু নয়। একরকম ছত্রাক।

ভেরি গুড। কবে পাওয়া যাবে?

মিস্টার বাসু ভুরু কুঁচকে ভেবে উত্তর দিলেন, আমার রিসার্চ এখনো সামান্য বাকি। সাত-আট দিন বাদে আমি জানাব এই ছত্রাক এবং তার উপযুক্ত ওষুধের ফরমুলা কবে নাগাদ আপনাদের দিতে পারব।

মিস্টার কার্পেন্টার বললেন, বেশ। আমি আপনার খবরের প্রতীক্ষায় থাকব। আর চিঠিটা দেবেন আমার নামে–কোম্পানির বোম্বাই হেড অফিসের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখে দেবেন–পার্সোনাল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কার্পেন্টার চুরুট ধরিয়েছেন। মিস্টার বাসু গম্ভীরভাবে টানছেন পাইপ। অল্প উসখুস করে কার্পেন্টার বললেন, আর একটি অনুরোধ।

বলুন।

আমার এক বন্ধু। বিদেশি। ওদের ফল-মূলের বিরাট কারবার। দেশে-বিদেশে চালান দেয়–বিশেষত আলু। গত দু-বছর ধরে ওদের কারবার মন্দা যাচ্ছে। কারণ প্রধানত যে দেশে ওরা আলু চালান দিত তারা অনেক কম কিনছে। ওই দেশে নাকি আলুর উৎপাদন বেড়েছে। ফলে বন্ধুর ফার্মের গুদামে প্রচুর আলু জমে গেছে। সে আল বাজারে বিক্রি করতে হলে অনেক কম দামে ছাড়তে হবে। বেজায় লোকসান। বন্ধু বলছিল, যদি কোণে উপায়ে অন্তত এক বছর ওই দেশে আলুর ফলন মার খেয়ে যায় তাহলে ওই দেশ ফের তার ফার্ম থেকে বেশি করে আলু কিনতে বাধ্য হবে। তাদের বাড়তি আলুর স্টকের সদগতি হয়ে যাবে। আমার বন্ধু ভাবছিল, দৈবের ওপর নির্ভর না করে কোনো কৃত্রিম উপায়ে যদি খদ্দের দেশটির আলুর ফলন নষ্ট করা যায়? আপনি কি এ-ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে। পারেন না? এজন্য সে যথেষ্ট খরচ করতেও রাজি।

কত? প্রশ্ন করলেন বাসু।

যদি মোটামটি তিরিশ ভাগ আলর ফলন নষ্ট করার ব্যবস্থা করতে পারে কেশ দুই দিতে আটকাবে না।

দ-লাখ টাকা! লোভে জ্বলজ্বল করে ওঠে মিস্টার বাসুর চোখ। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বাঁকা হেসে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "হয়তো এরকম ব্যবস্থাও আমি করতে পারি। একরকম ভাইরাস আমার নজরে এসেছে–যা আলুর পক্ষে মারাত্মক। এবং অতি দ্রুত তার বংশবৃদ্ধি ঘটে।

ও ভাইরাস? আচ্ছা ভাইরাস তো একরকম জীবাণু? গম্ভীর ভাবে বললেন কার্পেন্টার।

মনে মনে হাসলেন বাসু। বুঝলেন, মিস্টার কার্পেন্টার জাঁদরেল পরিচালক হতে পারেন কিন্তু ভদ্রলোকের প্রাণবিজ্ঞানের জ্ঞান কম। মিস্টার বাসু বললেন, ভাইরাসকে জীবাণু বলতে পারেন, আবার নাও বলতে পারেন। এদের কেউ বলে জড়। কেউ বলে জীব। বরং বলা যায় এই দুইয়ের মাঝামাঝি। এমনিতে এরা জড় অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোনো সজীব প্রাণী বা উদ্ভিদকোষের আশ্রয় পেলেই এরা বংশ বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ জীবন্ত হয়। আকারে অতি ক্ষুদ্র। খুব জোরালো মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না। এরা জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে নানা ধরনের রোগ ছড়ায়। এ যাবৎ অনেক রকম ভাইরাস আবিষ্কৃত

হয়েছে। আমি যে ভাইরাসের খোঁজ পেয়েছি তা আলুর ক্ষেতে ছড়ালে শতকরা ত্রিশ কেন চল্লিশ ভাগ ফসল ধ্বংস হতে বাধ্য।

স্পেনডিড! টেবিল চাপড়ালেন কার্পেন্টার। আমার বন্ধুর এজেন্টের হাতে ওই ভাইরাস তুলে দেওয়া মাত্র অর্ধেক পেমেন্ট পেয়ে যাবেন। বাকি অর্ধেক পাবেন কার্যসিদ্ধির পর।

আমার কিন্তু সময় চাই–অন্তত কয়েক মাস। ল্যাবরেটরিতে কালচার করে প্রচুর ভাইরাস তৈরি করতে হবে–এ তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়।

বেশ-বেশ। নিন সময়। আমি আমার বন্ধুকে সুসংবাদটি জানিয়ে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, আমার কোম্পানির ইন্টারেস্ট কিন্তু প্রথম। আগে আমার অর্ডারটা সাপ্লাই করে তারপর আমার বন্ধুর ব্যবস্থা।

নিশ্চয়। সম্মতি জানালেন মিস্টার বাসু।

বাইরে নির্বিকার দেখালেও মিস্টার বাসুর হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার। আঃ, আজ বড় শুভ দিন! কী বিরাট উপার্জনের সুযোগ এসে গেল–কত সহজে।

এবার মিস্টার বাসু বিদায় নিলেন।

প্রিন্স হোটেলের ঠিক উল্টো দিকে এসপ্লানেড। এলাকাটা তখন গমগম করছে। ফুটপাত ঘেঁষে লাগানো সারি সারি অপেক্ষমাণ মোটরগাড়ির পিছনে তিন ব্যক্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সুনন্দ, অসিত এবং মামাবাবু। তাদের দৃষ্টি ওই হোটেলের গেটে নিবদ্ধ। মিস্টার বাসুকে ঢুকতে দেখেছিল তারা। দেড় ঘণ্টা বাদে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

সুনন্দ অসিতকে নিয়ে মামাবাবু যখন এইখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন তখন অবাক হয়ে গিয়েছিল দুই বন্ধু। তারপর সামনের হোটেলে হঠাৎ মিস্টার বাসুকে ঢুকতে দেখে আঁচ করল ব্যাপার। তাকে দেখে মামাবাবু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, মিস্টার বাসু না?–হ্যাঁ–তারা ঘাড় নেড়েছিল। কিন্তু মামাবাবু কী করে এখানে এই সময়ে বাসুর আগমন হবে টের পেলেন সে-রহস্য তাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। বাসু ট্যাক্সি ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে দাঁড়ানো এক ট্যাক্সির চালক ঘাড় ফিরিয়ে মামাবাবুর দিকে চাইল। মামাবাবু কী জানি ইঙ্গিত করলেন তাকে। অমনি তার গাড়ির ইঞ্জিন সচল হয়ে উঠল। এবং সুনন্দরা লক্ষ করল যে বাসুর ট্যাক্সির পিছন ধরল এই ট্যাক্সিটা। দুটো গাড়িই মিলিয়ে গেল রাজপথে।

চলো ফিরি। বললেন মামাবাবু।

ঘণ্টাখানেক পরে টেলিফোন বাজতেই মামাবাবু ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিলেন রিসিভার। মিনিট পাঁচ কথা হল কারো সঙ্গে। রিসিভার নামিয়ে তিনি ডেকে বললেন, সুনন্দ রেডি হও। এখুনি বেরোতে হবে। মিস্টার পিল্লাই গাড়ি নিয়ে আসছেন আমাদের তুলে নিতে।

শুধু সুনন্দ নয়, মামাবাবুর সঙ্গে আরও দুজন যাবার জন্য প্রস্তুত। অসিত এবং কুণাল। বাড়ি ফিরেই সুনন্দ কুণালকে ফোনে ডেকে বলেছিল, মিস্টার বাসুর দেখা পাওয়া গেছে। একটা সিরিয়াস কিছু ঘটতে যাচ্ছে। চলে আয় এখানে। কুইক।

.

রাত প্রায় আটটা।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে এক ধূসর রঙা ফিয়াট গাড়ি।

গাড়ির সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন মামাবাবু এবং মিস্টার পিল্লাই। পিছনের সিটে–সুনন্দ, অসিত ও কুণাল।

মিস্টার পিল্লাই মাঝবয়সী, শক্তসমর্থ মানুষ। মাঝে মাঝে তিনি ও মামাবাবু নিচু সুরে কী সব পরামর্শ করছেন, কখনো ইংরেজিতে কখনো বা বাংলায়। পিল্লাইয়ের বাংলা ঝরঝরে। যদিও সামান্য অবাঙালি টান আছে। পিছনের তিন আরোহী বাক্যহারা। টানটান হয়ে একাগ্র চিত্তে লক্ষ্য রাখছে সামনের দুজনের হাব-ভাব।

হু-হু করে এগোয় মোটর। পেরিয়ে যায় সোদপুর, খড়দা, টিটাগড়–ক্রমে পৌঁছয় পথের শেষ প্রান্তে। ব্যারাকপুর।

গঙ্গার ধারে চওড়া পিচ-ঢাকা নির্জন রাস্তা। দু-পাশে বড় বড় কম্পাউন্ডওলা বাড়ি। বেশিরভাগ খুব পুরনো। এক রাস্তার মোড়ে গাড়ি থেমে পড়ল। গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে একজন কাছে এল। সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার। চৌরঙ্গীর প্রিন্স হোটেল থেকে মিস্টার বাসুর ট্যাক্সিকে অনুসরণ করেছিল যে।

মামাবাবু ও মিস্টার পিল্লাইয়ের সঙ্গে লোকটির কী জানি কথা হল। মামাবাবু সুনন্দদের ডাকলেন, নেমে এসো।

পিল্লাইয়ের গাড়ি সহ ড্রাইভার রইল সেখানে। বাকি ছয়জন হেঁটে চলল। পথ দেখিয়ে চলেছে সেই ট্যাক্সিচালক। একটা গেটের সামনে থামল ওরা। লোহার প্রকাণ্ড গেট। উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। দোতলা। বিশাল বিশাল গাছে অন্ধকার হয়ে আছে মস্ত বাগান। আবছা চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে লাগছে বাড়িখানা।

গেট ঠেললেন পিল্লাই। কাঁচ–শব্দ হল।

হঠাৎ কোত্থেকে সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক।

রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোতে দেখা গেল–লোকটা রীতিমতো গাঁট্টাগোট্টা। গায়ে স্পোর্টস গেঞ্জি ও ফুলপ্যান্ট। রুক্ষ মুখ।

মিস্টার বাসুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বললেন মামাবাবু।

এখানে মিস্টার বাসু বলে কেউ থাকে না। কড়া সুরে বলল লোকটা।

মামাবাবু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন তাদের গাইডের দিকে। নিঃশব্দে মাথা হেলাল লোকটি। এবার মামাবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, মিস্টার বাসু এখানে থাকেন কিনা জানি না। তবে আপাতত তিনি এ-বাড়িতে আছেন। আমরা তার সঙ্গে দেখা করব।

না, বাড়িতে ঢোকা চলবে না। লোকটি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে পথ আগলে দাঁড়াল। বোঝা গেল সে সহজে কাউকে ঢুকতে দেবে না। দরকার হলে হাঙ্গামা বাঁধাতেও প্রস্তুত।

মিস্টার পিল্লাই এবার পকেট থেকে একখানি কার্ড বের করে লোকটির চোখের ওপর তুলে ধরলেন। পুলিস–তাঁর মৃদু স্পষ্ট উচ্চারণ কারোরই কান এড়াল না।

লোকটা চমকে পিছিয়ে গেল কয় পা।

খবরদার পালাবার চেষ্টা কোরো না। পিল্লাইয়ের ডান হাতে আবির্ভূত হল এক চকচকে রিভলভার। তিনি ডাকলেন, ফাগুলাল।

ইয়েস স্যার। গাইড এসে লোকটির হাত চেপে ধরল। যাও এর সঙ্গে, কঠিন স্বরে আদেশ দিলেন পিল্লাই। লোকটা সুড়সুড় করে ফাগুলালের সঙ্গে চলে গেল যেদিকে পিল্লাই গাড়ি রেখে এসেছেন। সুনন্দদের বুঝতে অসুবিধে হল না যে পিল্লাই এবং ফাগুলাল পুলিসের লোক।

.

পাঁচজনে এবার এগিয়ে চলল দোতলা বাড়িখানা লক্ষ্য করে।

বাড়ির বাইরে মিটমিট করে জ্বলছে একটা বৈদ্যুতিক বাতি। নিচের তলা ঘুটঘুট করছে। মাথার ওপর ঝুলবারান্দা। দোতলায় একটিমাত্র জানলায় আলোর রেখা। সদর দরজা বন্ধ।

বাড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকে দলটা। পকেট থকে টর্চ বের করেছেন পিল্লাই। আলো। ফেলে দেখছেন একতলার প্রত্যেকটি জানলা। জানলাগুলো প্রকাণ্ড। খড়খড়ি লাগানো পাল্লাগুলো বন্ধ। তার পেছনে কাঁচের শার্শি আঁটা। গরাদ নেই। প্রত্যেক জানলার খড়খড়ি তুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করছিলেন পিল্লাই। হঠাৎ তিনি সামান্য খুটখাট করে

একটা জানলার পাল্লা খুলে ফেললেন। দেখা গেল সেই শার্শির একজায়গায় ভাঙা। পিল্লাই বললেন, একজন নিচে থাকুন পাহারায়। অন্যরা ভিতরে ঢুকবে। কে থাকবেন? আপনি? তিনি কুণালকে জিজ্ঞেস করলেন।

বেশ। কুণাল সম্মতি জানাল।

হাতে ভর দিয়ে জানলার আলসেয় উঠে ঘরের মধ্যে নেমে পড়ল একে একে চারজন। ভাগ্য ভালো, ঘরের দরজা ভেজানো। ঠেলতে খুলে গেল। মনে হল সেটা রান্নাঘর।

ঘর থেকে বেরিয়ে চওড়া প্যাসেজ। দু-পাশে ঘর। বেশিরভাগ দরজা হাট করে খোলা বা ভেজানো। ক্রমে সিঁড়ির মুখে হাজির হল তারা। দোতলায় কাদের কথা শোনা যাচ্ছে। পা টিপে টিপে চারজন ওপরে উঠল।

দোতলায় মুখোমুখি দুই দুই চারখানা ঘর। একটা ঘর থেকে ভেসে আসছিল মানুষের গলার আওয়াজ। অন্য ঘরগুলোয় জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। সবাই গিয়ে দাঁড়াল ওই ঘরের সামনে। দরজার কবাট বন্ধ। কবাটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভিতরের আলোর ক্ষীণ রেখা। মামাবাবুর দল দরজার গায়ে কান পাতল।

আর একবার ভালো করে ভেবে দেখ, তপন। কর্কশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলল কেউ।

আমি ভেবে দেখেছি মিস্টার বাসু। এ-গলা তপনের। চিনতে ভুল করেনি সুনন্দ বা অসিত।

অর্থাৎ আমার প্রস্তাব তুমি মানবে না?

সুনন্দর মনে হল এ-গলাও যেন তার চেনা। কোথায় শুনেছে।

মূর্খ! নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চাও? আমি এই শেষ বারের মতো জিজ্ঞেস করছি। বল রাজি কি না?

না না। তপন আর্তস্বরে বলে উঠল।

মিস্টার বাসু ধমকে উঠলেন, বোকামি কোরো না। বেশ! তোমায় আরও দু-হাজার। বেশি দিচ্ছি। মোট সাত হাজার টাকা। আর পুরনো ধার সব ছেড়ে দেব। এবং ভবিষ্যতে তোমার কাছে এ-ধরনের কিছু আর কখনো চাইব না।

আমায় মাপ করুন। আমার গুরু ডক্টর তালুকদার বলতেন, মানুষের মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞান। এ কাজ করলে তিনি স্বর্গ থেকে আমায় অভিশাপ দেবেন।

সাট-আপ! আবার লেকচার। বটে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। তোমার মতো একগুয়েকে ঢিট করার রাস্তা আমি জানি। শোনো, তোমার ছোট ভাই বিমান, আপাতত তাকে গায়েব করে এনে লুকিয়ে রেখেছি এক গুণ্ডার আড্ডায়। যদি আমার কথামতো না। চলো, তাকে আর কোনোদিন ফিরে পাবে না।

মিস্টার বাসু, প্লিজ! তপন কাতর অনুনয় জানাল। আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, আমি কৃতজ্ঞ। আমায় দয়া করুন।

দয়া? অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন বাসু।

দয়া-দাক্ষিণ্য বিতরণ আমার ব্যবসা নয়। আমি যা করেছি তার প্রতিদান চাই।

বলুন কীভাবে আপনার ঋণ শোধ করব। শুধু জেনেশুনে মানুষের ক্ষতি করতে পারব না। এইটুকু ভিক্ষা চাই। তাছাড়া যা আদেশ করেন। আচ্ছা আপনার তো টাকা চাই? আমায় একটু সময় দিন। এখনো আমাদের দেশে ফসলের কত রোগ দমন করার কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। আমি ওইসব রোগ প্রতিরোধের ওষুধ আবিষ্কার করব। তার সমস্ত স্বত্ব দিয়ে দেব আপনাকে। তাই থেকে প্রচুর রোজগার করতে পারবেন।

নো। অত অপেক্ষা করার সময় আমার নেই। আমি এখুনি টাকা চাই। অনেক–অনেক টাকা। এবং তার উপায় তোমায় বলেছি। কি রাজি?

না।

অল রাইট। তোমার জেদের ফল কী হবে জানো।

কী?

তোমার ভাইয়ের সর্বনাশ। ওকে জোর করে মরফিয়া ইনজেকশন দিয়ে নেশা ধরাব। নেশার জিনিসের লোভ দেখিয়ে তখন ওকে দিয়ে যে-কোনো কুকর্ম করানো যাবে। ভেবেছি, ওকে বানাব-ফার্স্ট ক্লাস খুনে গুণ্ডা। অবশ্য মরফিয়ার অভ্যেস ভালোমতো। ধরলে মানুষ বেশি দিন আর সুস্থ থাকে না। কয়েক বছরের মধ্যেই ও জড়বুদ্ধি বিকলাঙ্গ হয়ে মরবে।

শয়তান। ধড়াম করে শব্দ হল ঘরে।

উঃ! কাতরে উঠলেন মিস্টার বাসু। বিকৃত তর্জন শোনা গেল তার কণ্ঠে, "কী। আমার গায়ে হাত। দাঁড়াও, চাবকে তোমার ছাল তুলে দিচ্ছি।

সপাং সপাং। বাতাস কেটে চাবুকের হিংস্র হোবলের শব্দ শোনা গেল দু-দুবার। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল তপন।

ঘরের বাইরে চারজন রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। সুনন্দ আর স্থির থাকতে পারল না। দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চিৎকার করে উঠল-খবরদার। দরজা খুলুন মিস্টার বাসু। ভয় নেই তপন! আমি সুনন্দ।

মুহূর্তে ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দপ করে নিবে গেল ঘরের আলো।

খুট করে শব্দ হল। যেন ছিটকিনি খুলল কেউ। তারপর কবাট খোলর মৃদু আওয়াজ। সুনন্দ যেটা ঠেলছে সেটা কিন্তু খুলল না। মামাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, ও পালাচ্ছে। বারান্দার দরজা খুলে। নিশ্চয়ই বাইরে সিঁড়ি আছে নামার।

সুনন্দ অসিত দুড়দাড় করে ছুটল নিচে। তাদের মনে পড়েছে–একটা সরু ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দেখেছিল বাড়ির পিছনে। বাইরে থেকে ওই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠা-নামা করা যায়।

.

০৬.

অন্ধকার প্যাসেজ। সিঁড়ি হাতড়ে হাতড়ে এগোতে সময় নিল। নিচের সদর দরজা খুলে দুজনে ছুটল সিঁড়ির কাছে। কেউ কোথাও নেই। বিমূঢ় হয়ে এদিকে সেদিকে তাকাচ্ছে, কানে এল ভারী কিছু পড়ার শব্দ। তারপরই ধস্তাধস্তির আওয়াজ। ডান পাশে শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেল তারা।

পাঁচিলের কাছে দুজন ঝটাপটি করছে। একজন মাটিতে। অন্যজন তার বুকের ওপর।

সুনন্দরা পৌঁছনোর আগেই ওপরের লোকটি হেঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল পাঁচিলের দিকে। চাঁদের আলোয় চেনা গেল তাকে–মিস্টার বাসু।

ওকে ধর। চেঁচিয়ে উঠল বাসুর বাধাদানকারী কুণাল।

মিস্টার বাসু পাঁচিলের গায়ে লাফ দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুনন্দ ও অসিত।

বাপরে, বাসুর গায়ে কী প্রচণ্ড শক্তি। প্রথম ঝটকায় দুজনকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু একটু পরে তারা বাসুকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। রুমাল দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধল তার হাত।

একটা টর্চের আলো ছুটে আসছে। পিল্লাই এবং মামাবাবু। বাসুকে টেনে তুলে দাঁড় করানো হল। আলো পড়ল বাসুর মুখে। একি!

মিস্টার বাসুর নিখুঁত সাহেবি মূর্তি এখন বিপর্যস্ত। নেই তার চশমা। বোম ছিঁড়ে কোট আলগা। টুপিহীন মাথার চুল এলোমেলো। সেজন্য অবাক হয়নি কেউ। কিন্তু তার পরু গোঁফের এক অংশ খুলে ঝুলে পড়েছে কেন? এ যে নকল গোঁফ। আর মুখের শ্যামলকান্তির জায়গায় জায়গায় চটা উঠে নিচের চামড়ার ফরসা রং বেরিয়ে পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে! সবাই স্তম্ভিত নয়নে দেখল, মিস্টার বাসুর ছদ্মবেশ ভেদ করে যেন পরিচিত কারো আদল ফুটে উঠছে।

কুণাল এগিয়ে এল। তার কপাল কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।

মেক-আপখানা খোলো তো চাঁদু–বলতে বলতে সে হাত বাড়িতে এক টানে ছিঁড়ে নিল বাসু সাহেবের বাকি গোঁফ। যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল বাসুর মুখ।

একি! এ যে বঙ্কিম হাজরা!!

বঙ্কিমবাবু আপনি! ইউ স্কাউনড্রেল, মামাবাবু গর্জন করে ওঠেন। তিনি মিস্টার বাসু ওরফে বঙ্কিমবাবুর চুলে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, কালো রং মেখেছে। কিন্তু

সামনের দাঁত দুটো উঁচু করল কী করে? দেখি। হু, ফল্‌স টুথ। প্লাস্টিকের দাঁত বসিয়েছে আসল দাঁতের ওপর।

অসিত হাঁ হয়ে থেকে বলল, হাঁটা-চলা পালটে ফেলেছিল কেমন! এমনকি গলার স্বর অবধি। বাস্‌রে!

আমায় নিয়ে কী করতে চান?বললেন বঙ্কিম হাজরা। সাংঘাতিক নার্ভ বটে লোকটার। এখনো দমেনি। তবে ভক্ত বঙ্কিমের গদগদ বিনয়ের মুখোশ খসে পড়েছে। মারমুখী তেরিয়া ভাব।

অ্যারেস্ট। এতক্ষণে কথা বললেন মিস্টার পিল্লাই। তিনি খানিক দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফোকাস করে রেখেছিলেন বঙ্কিমবাবুর ওপর।

প্রশ্ন হল, কেন?

পিল্লাই উত্তর দিলেন, একনম্বর চার্জ তপনবাবুর ওপর অত্যাচার। দু-নম্বর–তার ভাইকে অপহরণ। তিন নম্বর–দেশের ক্ষতিকারক অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ।

“ননসেন্স! আপনার তৃতীয় অভিযোগের কোনো প্রমাণ নেই।

আছে। তপনবাবু তার সাক্ষী। এবং দ্বিতীয় সাক্ষী আমি। কি, চিনতে পারেন?

পিল্লাই টর্চের আলো ঘুরিয়ে নিজের মুখে ফেললেন।

ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল বঙ্কিম হাজরা, অ্যাঁ, মিস্টার কার্পেন্টার।

সরি। আমি ভারত কেমিক্যালস-এর ডিরেক্টর কার্পেন্টার নই। আমি ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল অফিসার নারায়ণ পিল্লাই। ডিউটির খাতিরে মিস্টার কার্পেন্টারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, প্রিন্স হোটেলের কুড়ি নম্বর ঘরে কার্পেন্টারের সঙ্গে আপনার সমস্ত গোপন কথাবার্তা, ষড়যন্ত্র, টেপ-রেকর্ডে ধরা আছে। রেকর্ডটা লুকনো ছিল সোফার নিচে।

বঙ্কিম হাজরার চোখে-মুখে এবার সত্যিকার ভয়ের ছাপ দেখা গেল।

সুনন্দ অসিত ছুটল তপনকে আনতে।

বঙ্কিমবাবুকে দেখে আহত শ্রান্ত তপন হতভম্ব–। একি, মিস্টার বাসু! না-না, এ যে বঙ্কিমবাবু!

মামাবাবু বললেন, তুমি চেনো একে?

চিনি। তবে আলাপ নেই। স্যার, মানে ডক্টর তালকদারের কাছে আসতেন মাঝে মাঝে, দেখেছি। কিন্তু উনি?

হ্যাঁ, মিস্টার বাসুই ছদ্মবেশী বঙ্কিম হাজরা। উত্তর দিলেন মামাবাবু।

সবার মনেই উদগ্র কৌতূহল, কী করে তপন এই লোকটির খপ্পরে পড়ল। কিন্তু তখন আর এ-প্রশ্নের জবাব পাবার সুযোগ ছিল না।

বাড়ি সার্চ করা হল। একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস আবিষ্কার হল–একটা ছোট ল্যাবরেটরি।

মামাবাবু কুণালের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, সাবাস কুণাল। খুব সময়ে আটকেছ বাসুকে। একবার নাগালের বাইরে ফসকে গেলে বাসু সাহেব নির্ঘাত চিরকালের মতো অদৃশ্য হত। অর্থাৎ সে খোলস ছেড়ে বঙ্কিম হাজরা বনে যেত। আর এই অপরাধে বঙ্কিম হাজরার যোগ আছে সন্দেহ করলেও তাকে শাস্তি দেবার মতো প্রমাণ আমাদের হাতে ছিল। না। আর ওই যে স্বয়ং মিস্টার বাসু এ কার মাথায় আসবে?

.

প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ অর্থাৎ মামাবাবুর বালিগঞ্জের বাড়ির বৈঠকখানা।

একে একে সেখানে হাজির হল অনেকে–অসিত, কুণাল, সুনন্দর ডানপিটে বন্ধু মিন্টু, মিত্র কেমিক্যালস-এর সেলসম্যান হরিধন এবং সব শেষে এলেন আই. বি. ইন্সপেক্টর মিস্টার নারায়ণ পিল্লাই, সঙ্গে তপন দত্ত। মামাবাবু ও সুনন্দ তো উপস্থিত রয়েছেনই।

ব্যারাকপুরে বাগানবাড়িতে মিস্টার বাসু ওরফে বঙ্কিম হাজরা ধরা পড়ার দুদিন পরে এক বিকেলে এই জমায়েত। ইতিমধ্যে তপন ছিল পিল্লাইয়ের হেফাজতে। পুলিস তাকে জেরা করেছে, নানা জায়গায় নিয়ে ঘুরেছে। ফলে তার সঙ্গে সুনন্দ অসিত ইত্যাদির সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। এই জটিল রহস্যের বহু প্রশ্নই তাই এখনো তাদের অজানা। শুধ একটি সুসংবাদ জানতে পেরেছে–তপনের বন্দী ছোট ভাই বিমানকে অক্ষত দেহে উদ্ধার করেছে পুলিস।

অতিথিদের জন্য চা এবং কিঞ্চিৎ টা সরবরাহ হল।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মামাবাবু বললেন, প্রথমে শোনা যাক তপনের কথা। কী করে সে মিস্টার বাসু, মানে বঙ্কিম হাজরার পাল্লায় পড়ল! বলো তপন–

তপন বলতে শুরু করল।

প্রায় চার বছর আগে ডক্টর তালুকদার যখন হঠাৎ মারা গেলেন বিদেশে চোখ অন্ধকার দেখলাম। আবার নিঃসহায় হয়ে পড়লাম। ডক্টর তালুকদারের কাছে কাজ পেয়ে বর্তে গিয়েছিলাম। তার আগে বেশ কয়েক বছর আমার বড় করুণ অবস্থায় কেটেছিল। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নেই। নেই সহায় সম্বল। বাবা মারা গেছেন। সংসারের পুরো দায়িত্ব আমার কাঁধে। প্রাণপণে চাকরির চেষ্টায় ঘুরেছি। কখনো জুটেছে কিছু। কখনো বেকার। ডক্টর তালুকদারের সঙ্গে আলাপ হয় শিল্পমেলায়। অতি মহৎ ব্যক্তি। আমার দুঃখের কাহিনি শুনে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। কোনো প্রতিষ্ঠান বা সরকারি অফিসে নয়। তেমন কিছু তার হাতে ছিল না। ওঁর নিজস্ব রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্ট করে নিলেন। এ বাড়িতে একটা ল্যাবরেটরি ছিল—সেখানে কাজ।

শুধু যে খেয়ে বাঁচলাম তাই নয়। আরও বড় উপকার হল—আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম। কাজটা ভালোবেসে ডুবে গেলাম ওই রিসার্চে।

কী নিয়ে রিসার্চ? জানতে চাইল কুণাল।

মানুষের প্রয়োজনীয় ফলমূল শস্যের বোগ অর্থাৎ উৎপাদন নষ্টের কারণ যেসব পোকামাকড়, ব্যাকটিরিয়া, ফাঙ্গাস, ভাইরাস তাদের নিয়ে ছিল তাঁর গবেষণা। শুধু আমাদের দেশের চেনাশোনা ফসল-রোগ নিয়ে মাথা ঘামানো নয়, আরও সুদূরপ্রসারী ছিল তাঁর চিন্তা। যেসব ফসল-রোগ আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অজানা বা সামান্য দেখা

গেছে। তাদের নিয়েও স্টাডি করতেন। উদ্দেশ্য ছিল–ভবিষ্যতে ওইসব রোগ যদি এখানে ছড়ায় তখন তাদের রোধ করা।

গমের নৈতানো রোগ এদেশে এল কোথেকে? জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু।

দক্ষিণ আমেরিকা। দেখা গেছে, ফসলের শত্রু কোনো কোনো কীট, জীবাণু, ছত্রাক ইত্যাদি এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে পরিবেশ বদলের ফলে ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। গমের নেতানো রোগের জীবাণু দক্ষিণ আমেরিকায় গমের অল্পস্বল্প ক্ষতি করে কিন্তু ভারতের আবহাওয়ায় কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

এ জীবাণু আনল কে? বললেন মামাবাবু।

স্যার। মানে ডক্টর তালুকদার। গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন।

আচ্ছা, ধানের রাক্ষুসে পোকার ব্যাপারটা কী? ফের প্রশ্ন করলেন মামাবাবু।

এও স্যারের এক আশ্চর্য রিসার্চের ফল। আপনারা হয়তো জানেন, ফসল-রোগ ঠেকাতে কয়েকটি রাসায়নিক বস্তু ক্রমাগত ব্যবহার করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছয় যখন রোগের কারণ পোকামাকড় বা জীবাণু ইত্যাদি দমন করতে ওইসব ওষুধে আর কাজ দেয় না। কারণ তাদের শরীরে ওই ওষুধকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তখন

অন্য রাসায়নিক বা আর কোনো উপায় খুঁজতে হয়। ডক্টর তালুকদার এই লাইনেও গবেষণা করতেন। উনি রাক্ষুসে পোকা ল্যাবরেটরিতে এমনভাবে লালন করেছিলেন যে তাদের শরীরে ওই কীটনাশকগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি তৈরি হয়েছিল। তারপর ফের তাদের দমন করার জন্য তিনি ওষুধ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। অনেকখানি এগিয়েছিল রিসার্চ। আমি তা শেষ করি।

অতি বিপজ্জনক গবেষণা। এসব স্পেসিমেন কোনোক্রমে বাইরে ছড়িয়ে পড়লে দেশের উৎপাদনে মহামারী ঘটাতে পারে।

হ্যাঁ, তাই তিনি এই ধরনের রিসার্চ বা এক্সপেরিমেন্ট করতেন খুব গোপনে। নিজের বাড়ির ল্যাবরেটরিতে। ডক্টর তালুকদারের এই গবেষণায় আমি ছিলাম তার সহকারী। ক্রমে স্বাধীন গবেষণা করার মতো খানিক বিদ্যে-বুদ্ধিও আমার হয়েছিল। স্যার আমায় উৎসাহ দিতেন। কাজ শেখাতেন। এ বিষয়ে বই দিতেন পড়তে।

তপন চোখ বন্ধ করে অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। বুঝি পরম শ্রদ্ধেয় সেই পরলোকগত বিজ্ঞানীর স্মৃতিচারণ করল। তারপর আবার বলল–

প্রায় ছ-মাস বেকার হয়ে ছিলাম। নিজের দঃখের চেয়ে মা-ভাই-বোনের কষ্টটাই বেশ পাগল করে তুলেছিল। সেই সময় মিস্টার বাসুর সঙ্গে আলাপ হল। মানিকতলায় একটা বস্তির খুপরি ঘরে থাকতাম। আমার পাশে থাকত এক রাজমিস্ত্রি। বাসু সেই মিস্ত্রির

খোঁজে এলেন এক দুপুরে। মিস্ত্রি নেই, কাজে বেরিয়েছে। বাসু আমাকে ডেকে অনুরোধ করলেন মিস্ত্রিকে কটা কথা বলে দিতে। ব্যস, এই সূত্র ধরেই ভাব করে ফেললেন আমার সঙ্গে। এখন বুঝি উনি ওই মতলব নিয়েই এসেছিলেন। মিস্ত্রির খোঁজ করতে আসা স্রেফ ছুতো।

যাহোক মিস্টার বাসু আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন। আমি যদি একটা নার্সারি কার তাহলে জমি ও বাড়ি দেবেন, এবং ব্যবসার প্রয়োজনীয় টাকা–ধার হিসেবে।

নার্সারি সম্বন্ধে তুই কিছু জানতিস? সুনন্দর প্রশ্ন।

কিছু না। কিন্তু আমি তখন মরিয়া। নার্সারির ব্যাপার, তাই সই। আগের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না বটে, তবে ফুল-ফল গাছের যত্ন ও তত্ত্বাবধান শিখছিলাম স্যারের কাছে। মস্ত বাগান ছিল তার।

–আর একটা লোভ দেখিয়েছিলেন বাসু। তাই না? মুচকি হেসে বললেন পিল্লাই।

–হা। অতি লোভনীয় প্রস্তাব।–বলেছিলেন ইচ্ছে হলে, নার্সারিতে ল্যাবরেটরি তৈরি করে আমি নিজে রিসার্চ করতে পারি। ডক্টর তালুকদারের অসমাপ্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে পারি। ডক্টর তালুকদারের অনেকগুলি গবেষণা অর্ধসমাপ্ত বা প্রায় সমাপ্ত অবস্থায় ছিল।

ল্যাবরেটরি বানাবার খরচও ধার দেবেন মিস্টার বাসু। তখন অবশ্য বুঝেছিলাম, ডক্টর তালুকদারের গবেষণার মূল্য বাসু জানেন।

কেন ডক্টর তালুকদারের ল্যাবরেটরির কী হল? জানতে চাইলেন মামাবাবু।

বন্ধ হয়ে গেছিল। ওঁর একমাত্র ছেলে থাকত দিল্লিতে। বিজ্ঞানের ধার ধারে না। সে ল্যাবরেটরির দামি যন্ত্রপাতি বিক্রি করে বাকি জিনিস বিলিয়ে দিতে চাইল। আমায় বলল–যা ইচ্ছে হয় নিয়ে যাও। এমনকি বাবার গবেষণা সংক্রান্ত নোটও দিয়ে দিল আমায়। আসলে সে যত তাড়াতাড়ি পারে বাড়িটা খালি করে ভাড়া দিতে চাইছিল। আমি মহা খুশি। আমার ভবিষ্যৎ গবেষণার সমস্ত উপকরণ নিয়ে এসে রেখেছিলাম সেই বস্তির কুঠুরিতে। তবে দিনে দিনে ভয় হচ্ছিল, হয়তো এগুলি আমার আর কাজে লাগবে না। ল্যাবরেটরিতে গবেষণার সুযোগ আমি আর পাব না। এক-একবার ভাবতাম নষ্ট করার চেয়ে এসব বরং দিই অন্য কোনো গবেষককে। তাই বাসুর প্রস্তাব লুফে নিলাম। তার কাছে ধার নিয়ে ল্যাবরেটরি খাড়া করে ফেললাম নার্সারিতে। ফসলের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো জমিও পেলাম খানিকটা।

বঙ্কিম হাজরা কি প্রথম থেকেই তোমার রিসার্চ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিল? জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু।

না। প্রথম দ-তিন মাস তিনি এ-বিষয়ে কোনো ইন্টারেস্টই দেখাননি। তারপর খোঁজ নেন।

ক্রমে ওর কাছে আমার ধার আরও বাড়ল। আমার ছোট ভাই মরণাপন্ন হল। শিগগিরই হার্ট অপারেশন করতে বললেন ডাক্তার। প্রচুর খরচ। মিস্টার বাসু তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। এরপর আমায় আরও পাঁচ হাজার ধার দিলেন একরকম গায়ে পড়ে–আমার বোনের বিয়ের খরচের জন্য। আমি তো মুগ্ধ। বললাম–কী করে যে শোধ দেব জানি না। তিনি বলেছিলেন–কেন, তোমার গবেষণা আছে। তার কথার তাৎপর্য সেদিন ধরতে পারিনি।

ছ-সাত মাস পরে তিনি নিজ মূর্তি ধরলেন। অর্ডার দিলেন। ধানের রাক্ষুসে পোস চাই। কালচার করে প্রচুর পরিমাণে স্পেসিমেন দিতে হবে। এবং এই রোগ দমন করার কীটনাশক ওষুধের ফরমুলা–যা আমি আবিষ্কার করেছি। এ-বিষয়ে সমস্ত গবেষণাগত তথ্যসুদ্ধ। উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতাবোধে আমার রিসার্চ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলে ফেলেছিলাম বাসুকে।

ওনার দাবি শুনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম–কেন? এ নিয়ে কী করবেন আপনি? উত্তরে বললেন–আমিও এ-বিষয়ে একটু কাজ করতে চাই।

খুব বিশ্বাস হয়নি তার কথা। কারণ মোটামুটি বিজ্ঞান জানেন বুঝলেও এত দুরূহ গবেষণা করার যোগ্যতা ওঁর কাছে আছে কিনা আমার সন্দেহ ছিল। ভেবেছিলাম, হয়তো আমার রিসার্চ উনি নিজের নামে ছাপিয়ে নাম কিনতে চান। অথবা ভবিষ্যতে ভারতে এই পোকার উপদ্রব বাড়লে ওই কীটনাশকের ফরমুলা গোপনে বিক্রি করে পয়সা কামাবার তালে আছেন।

তবু দিলি? রেগে বলল অসিত।

কী করব? আমি তখন নিরুপায়। বাসুর কাছে দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে। তাই হুকুম তালিম করতে বাধ্য হলাম। মনে হল, এইভাবে যদি আমার ঋণ শোধ হয় তোক।

কিছুদিন পরে তিনি গমের নেতানো রোগের জীবাণু চাইলেন। এবং তার প্রতিরোধক ওষুধের ফরমুলা। শুধু যে শস্য রোগের বীজ এবং তাদের ওষুধ তৈরির ফরমুলা নিলেন তাই নয়। কী করে ওইসব রোগ সৃষ্টিকারী পোকা জীবাণু ইত্যাদির ল্যাবরেটরিতে কালচার করে বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয় সে পদ্ধতিও আমার কাছে শিখে নিলেন বাসু। আবার মাঝে মাঝে এসে যে গবেষণাগুলি নিয়েছিলেন সে-বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন আমাকে এবং আমার রিসার্চ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে একদম নিষেধ করে দিলেন।

নানান প্রশ্ন দেখা দিল মনে। তবু ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না ওঁর আসল উদ্দেশ্য কী। বাইরের খবরাখবর তো প্রায় রাখতামই না। মাসান্তে একবার বাড়ি যেতাম। দু-একদিন থাকতাম বড় জোর। এদেশের কৃষি-পত্রিকাগুলো আসত বাসু মারফত। আমার সন্দেহ জাগতে পারে এমন খবর থাকলে নিশ্চয় উনি সেসব সংখ্যা চেপে গিয়েছেন।

তুমি প্রথম হাজরা আই মিন বাসুকে সন্দেহ করলে কখন? মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

যখন সুনন্দ আর অসিত এল নার্সারিতে, ওদের কথা শুনে আমার চোখ ফুটল। বুঝতে পারলাম, কী জঘন্য ষড়যন্ত্র করছেন মিস্টার বাসু, আমারই আবিষ্কারকে হাতিয়ার বানিয়ে। কারণ বাসু আমার কাছ থেকে রাক্ষুসে পোকা নিয়ে যাওয়ার পরই এর উপদ্রব দেখা দেয়। তাছাড়া গমের নেতানো রোগ এদেশে এল কী করে?

বুঝতে পারলাম, আমারই কালচার করা ফসলের শত্রু, কীট, জীবাণু বাসু ছাড়ছে দিচ্ছেন ক্ষেতে। ফসল নষ্ট হতে শুরু করলে তখন বিক্রি করছেন প্রতিরোধের ওষুধ। কিন্ত রোগ আটকাবার আগেই যে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়। দেশের কত বড় ক্ষতি। ঠিক করলাম, এইসব ভয়ঙ্কর ধ্বংসের বীজ আমি আর কিছুতেই বাসর হাতে তুলে দেব না।

–বাকিটুকু আমি বলি। আপনি রেস্ট নিন তপনবাবু। বললেন মিস্টার পিল্লাই। বাসু আবার চাইতে এলেন ধানের ক্ষতিকারক একজাতের ছত্রাক এবং আলুর পক্ষে মারাত্মক

একরকম ভাইরাস। তপনবাবু দিতে অস্বীকার করলেন। তখন ভীষণ চাপ দিতে লাগলেন। প্রথমে দেখালেন লোভ। কাজ না হতে আরম্ভ হল অত্যাচার। তাইতো?

ক্লান্তভাবে মাথা নাড়ে তপন।

ইস, সেদিন আমি থাকলে–লোকটাকে এমন উত্তম-মধ্যম–তোরা কিস্‌সু কাজের নস! মিন্টু দীর্ঘশ্বাস ফেলল আফশোসে। কী করব? মামাবাবুরা এসে পড়লেন যে। ত, নইলে– সাফাই গাইল সুনন্দ।

তোমাকে বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল কেন? কুণাল জিজ্ঞেস করল তপনকে।

দুজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হয়েছে জানতে পেরে। নিশ্চয় মালিদের কাছে শুনেছিলেন। তখন আমায় নার্সারি থেকে সরিয়ে আনেন। তবে বন্ধুদের সঠিক পরিচয় আমি বলিনি।

আমি কিন্তু সত্যি সত্যি ওঁর ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই উপায়ে? নাঃ, অসম্ভব।

তোর ঋণ শোধ হয়ে গেছে। বলে উঠল সুনন্দ।

কী করে? তপন অবাক।

তোর তৈরি ফরমুলা বেচে উনি পাক্কা বিশ হাজার টাকা কামিয়েছেন।

তাই নাকি? তপন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আচ্ছা পুলিস, মানে মিস্টার পিল্লাই ব্যাপারটা জানলেন কী করে? প্রশ্ন করল অসিত। আমি জানিয়েছি, বললেন মামাবাবু। যখন তিন-তিনটে সাসপেক্ট বেপাত্তা হয়ে গেল তখন আমার পরিচিত এক পুলিস কমিশনারকে বললাম সমস্ত ঘটনা। তিনি মিস্টার পিল্লাইকে কেসটা তদন্ত করার ভার দিলেন। আমরা পরামর্শ করে কলকাতা বোম্বাইয়ের যত নামকরা ওষুধ কোম্পানিকে জানিয়ে রাখি, কেউ গমের নেতানো রোগ দমনের ওষুধের ফরমুলা বিক্রি করতে চাইলে যেন তৎক্ষণাৎ পিল্লাইকে খবর দেওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই বাসুর প্রস্তাব এল ভারত কেমিক্যালস-এর কাছে। মিস্টার পিল্লাই ওই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেজে বাসুর সঙ্গে দেখা করলেন। আচ্ছা মিস্টার পিল্লাই বঙ্কিম হাজরার অতীত ইতিহাস কিছু জানতে পারলেন?

পেরেছি কিছু কিছু। বললেন পিল্লাই। লোকটা শিক্ষিত। সায়ান্স গ্র্যাজয়েট। এককালে শখের থিয়েটারে অ্যাকটিং করে বেশ নাম করেছিল। নানারকম ব্যবসা করত। বছর দশ আগে এক নামকরা কোম্পানির ফাউন্টেন পেনের কালি জাল করার ব্যাপারে সন্দেহ করে পুলিস ওকে ধরেছিল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে খালাস পেয়ে যায়। বছর পাঁচেক

আগে বোম্বেতে স্মাগলিং শুরু করে। ছদ্মবেশে এবং ছদ্মনামে। তারপর একটা খুনের কেসে পুলিস ওর পিছ নিতেই বেমালুম উবে যায়। আর তার পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তবে পলিস রেকর্ডে স্মাগলার শাহাজাদার ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে। বঙ্কিম হাজরার আঙুলের ছাপের সঙ্গে তা মিলে গেছে। সে-মামলাও এবার ওর ঘাড়ে চাপবে।

লোকটা অসাধারণ চতুর। বললেন মামাবাবু। আমার ধারণা, ও প্রথম দিকে নিজে হাতেই লুকিয়ে লুকিয়ে ধান আর গমের রোগের বিষ ছড়িয়েছে ক্ষেতে। কিন্তু স্যার ডেভিডের বোর্নিও অ্যাডভেঞ্চার শোনার পরে যাযাবর পাখির মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়া ছড়ানোর আইডিয়া ওর মাথায় আসে। কারণ তারপরেই ও আমার কাছ থেকে মাইগ্রেটরি বার্ড সম্বন্ধে কয়েকটা বই নিয়েছিল। আর আমাদের সঙ্গ ধরার হেতু, নিরীহ পক্ষিবিদদের দলে ঘুরলে কেউ ওর মতলব টের পাবে না।

রাইট। সায় দিলেন মিস্টার পিল্লাই। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এমন এক ধূর্ত ক্রিমিনালকে গ্রেফতার করতে সাহায্য করার জন্য পুলিস ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবাই খুশিতে ভরপুর। সবার মুখে হাসি। শুধু তপন কেমন বিমর্ষ।

সুনন্দ অসিত কুণালের চোখে-চোখে কী জানি ইশারা খেলে গেল।

সুনন্দ বলল, তপন এবার কী করবি? সুরভি নার্সারি তো গণেশ ওলটাল।

হুঁ, ভাবছি তাই। ম্লান হাসে তপন। আমার কপালই খারাপ।

কুণাল উঠে গিয়ে বসল তপনের পাশে। বলল–ভাই তপন, তুমি তো শুনেছ আমার একটা ছোট ফার্ম আছে। ফসল রোগের কীট বা জীবাণুনাশক ওষুধও তৈরি করি। আমার কারখানার ল্যাবরেটরিতে যদি তোমায় চিফ কেমিস্টের পোস্ট দিই, নেবে? তোমার। প্রতিভার যোগ্য মূল্য দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবু যথাসাধ্য দেব।

সুনন্দ ফট করে চেঁচিয়ে উঠল–খবরদার তপন। নিস্‌নে ও চাকরি। কুণালটা মহা ধড়িবাজ। তোকে বেকায়দায় পেয়ে ঠকাচ্ছে। সস্তায় সারছে। আরে তোর টাকার ভাবনা কী? স্বয়ং ভারত কেমিক্যালস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার কার্পেন্টার এখানে হাজির। ওঁর অফারটা শুনেছিস। দু-লাখ তো তোর হাতের মুঠোয়।

হো-হো করে হেসে উঠলেন পিল্লাই। হেসে উঠল অন্যরা। তপন পরম কৃতজ্ঞভাবে– কুণালের ডান হাতখানি জড়িয়ে ধরল নিজের হাতে। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের আবেগে মুখে তার কথা সরল না। তবে আনন্দ উজ্জ্বল চোখে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল কুণালের প্রস্তাবে।